KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 5/1 5/4 6/1 6/2	Year of Publication : July 81 Jan - March - April - Jun 82 Oct 82 Oct - Dec 82, Jan - March 83 Condition : Brittle / Good
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিভাব

বিভাব

২০

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিভাব

সেরা উপহার

এন বি. টি-র নানা স্বাদের বই

এন, বি, টি-র তালিকায় রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বই আপনার জন্য, পরিবারের সবার জন্য, নানা ভাষাভাষী বন্ধু-বান্ধবের জন্য বেছে নিন মনের মতো বই। গড়ে তুলুন এক সত্যিকারের সংগ্রহ। মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় সংগ্রহ।

কয়েকটি বাংলা বই—

ছোটোদের জন্য প্রতি বই আড়াই টাকা

নদী কথা। লীলা মজুমদার
সরস গল্প। মনোজ দাস
যে সব আবিষ্কারে দুনিয়া পাল্টে গেছে। মীর নিজামত আলি
ফুল ও মৌমাছি। অশোক দাবর ১.৫০ টাকা
কেমন করে সিনেমা তৈরী হয়। কে. এ. আব্বাস

কিশোরদের জন্য

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এম. কে. বোস ৪.৭৫
হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী। পদ্মিনী সেনগুপ্ত ৪.০০
ভগিনী নিবেদিতা। বসুধা চক্রবর্তী ৫.০০
কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটার। রুশি মোদী ৮.৫০
আজাদ হিন্দ ফৌজ। এস. এ আয়ার ৬.৫০
আমাদের জল সম্পদ। ডঃ রাম ৬.০০
আমাদের সূর্য। হরিশ অগ্রবাল ৫.২৫

নাট্যামোদীদের জন্য

অসমীয়া একাঙ্ক গুচ্ছ ও পিয়লী ফুকন। অনুঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য ১৩.৫০
বনহংসী ও শ্বেতপদ্ম (দুটি ওড়িয়া নাটক)। মনোরঞ্জন দাস ৭.২৫
হিন্দী একাঙ্কী। অনুঃ দিলীপ ঘোষ ১২.৭৫

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লী-১১০০১৬
এন, বি, টি, বুক সেণ্টার, ৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলি-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা ১৩৮৯
বিভাব

নাটক

আহুতি। এউরিপিদিস-এর ইফিগেনেইয়া হেন আউলিদি নাটকের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদক—শিশিরকুমার দাশ ১

শিল্পভাবনা

রদাঁর প্রদর্শনী। সবিতা সরকার ৬৭

আলোচনা

আলো আরো আলো। শর্মিলা বসু ৭০

কবিতাগুচ্ছ

কালীকৃষ্ণ গুহর কবিতা। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ৮২
কালীকৃষ্ণ গুহর ছয়টি কবিতা ৮৪

গল্প

স্বর্গলোক মর্তলোক। জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ৮৮

সাময়িক প্রবন্ধ

কার্ল মার্কস। প্রদীপচন্দ্র বসু ১০৬

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

সুবিমল লাহিড়ী প্রদীপ দাশগুপ্ত

শচীন দাশ দেবীপ্রসাদ মজুমদার

সম্পাদকীয় দপ্তর

৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলকাতা-১৭

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ/অনুপ রায়

অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

কভার মুদ্রণ : দি র‍্যাডিয়্যান্ট প্রোসেস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭ হইতে প্রকাশিত এবং অবনীমোহন রায় কর্তৃক তারকনাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২ বিনোদ সাহা লেন, কলকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

নাটক

আহুতি

এউরিপিদেস-এর ইফিগেনেইয়া হেন আউলিদি নাটকের
বাংলা অনুবাদ

শিশিরকুমার দাশ

অনুবাদ করা হয়েছে Clinton E. S. Headlam সম্পাদিত গ্রীক পাঠ (কেম্ব্রিজ ১৯২২) অবলম্বনে। বিভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ থেকে সাহায্য নিয়েছি, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, Moses Hades & John Harry Mclean, **The Plays of Euirpides** (The Dial Press, New York 1936), W. S. Medwin and G. E. Dimock, Jr., **Iphigencia at Autas** (Oxford University Press, New York, 1978) ; F. M. Stawell, **Iphigenia in Autes**, (**The Complete Greek Drama**, Vol. II ed. W. J. Oates and Eugene O'neills Dr. Random House, New York, 1938)

আর্গোসের অধিপতি আগামেমনোন। তাঁর ভাই মেনেলাওসের সঙ্গে হেলেনের বিয়ে হয়েছিল। হেলেনকে ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস বা আলেকজান্দার অপহরণ করে নিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ মেনেলাওস তখন সমস্ত গ্রীকদের ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহী করে তোলেন। গ্রীসের সমস্ত অঞ্চলের বীরপুরুষেরা তাঁদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে ট্রয় অভিযানের জন্য তৈরী হন। অসংখ্য সৈন্য। বিপুল অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রচুর যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তাঁরা ট্রয়ের দিকে এগোতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা যখন এউরোনিয়া সমুদ্রের ধারে আউলিসে এসে পৌছলেন তখন হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, জাহাজের গতি হল রুদ্ধ। দিনের পর দিন সৈন্যরা আটকে রইল আউলিসে।

আগামেমনোন ছিলেন এই বিরাট অভিযানের নেতা। কি কারণে এত বড়ো উদ্যোগ এভাবে বাধা পেল তা জানার জন্য তিনি ডাকলেন গ্রীক দৈবজ্ঞ কালখাসকে। কালখাস জানালেন যে আউলিসের দেবী কুমারী আর্তেমিস আগামেমনোনের প্রতি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। দেবী প্রসন্ন হলে তবেই আবার অনুকূল হাওয়া উঠবে, তবেই গ্রীক নৌবহর আবার সমুদ্র যাত্রা করতে পারবে। দেবী চান আগামেমনোনের কন্যা ইফিগেনেইয়ার উৎসর্গ। ট্রয় যাত্রা যদি সম্ভব করতে হয় তাহলে ইফিগেনেইয়াকে আহুতি দিতে হবে দেবীর বেদীমূলে।

এই দৈবনির্দেশের কথা আগামেমনোন ছাড়া জানলেন আর দুজন সেনাপতি—মেনেলাওস এবং ধূর্ত ওপেসসেউস। প্রথমে আগামেমনোন এই ভয়াবহ প্রস্তাব শুনে শিহরিত হয়েছিলেন। কিন্তু মেনেলাওসের প্ররোচনা এবং তাঁর নিজের ক্ষমতার লোভে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর স্ত্রী ক্লুতায়মনেস্ত্রাকে চিঠি দিলেন যেন ইফিগেনেইয়াকে নিয়ে আউলিসে তাঁরা চলে আসেন। সেই সঙ্গে তিনি এক বিরাট মিথ্যার আশ্রয় নিলেন। চিঠিতে লিখলেন যে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীকবীর আখিল্লেসের সঙ্গে তিনি ইফিগেনেইয়ার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন এবং ট্রয় অভিযান শুরু হবার আগেই তিনি বিয়ে দিতে চান।

এই চিঠি লেখার পর থেকেই অবশ্য আগামেমনোনের মন অন্তর্দাহে জ্বলতে লাগল। একদিকে প্রতীক্ষমান অধীর সৈন্যদল, সমুদ্রের আহ্বান, ট্রয়ধ্বংসের সম্ভাবনা, যশ, প্রতিষ্ঠা, সম্মানের লোভ; অন্যদিকে তাঁর পিতৃহৃদয়ের বেদনা। তাঁর আদরের কন্যার জীবন। একদিন সমস্ত রাত আগামেমনোনের চোখে ঘুম ছিল না, সমস্ত রাত ধরে তিনি ভেবে ভেবে ঠিক করলেন যে

ক্লুতাইমনেস্ত্রাকে আসতে নিষেধ করবেন। এই অবস্থাতেই এউরিপিদিসের নাটক—আউলিসে ইফিগেনেইয়ার শুরু।

মধ্যরাত্রি, আকাশে লুব্ধক তারা সাতভাই নক্ষত্রমণ্ডলীর পেছনে। সমস্ত পৃথিবী এখন শান্ত, সমুদ্রে ঢেউ নেই, কোথাও বাতাস নেই। শিবিরে সৈন্যরা ঘুমন্ত, প্রহরীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন। শুধু আগামেমনোনের শিবিরে আলো। তিনি শিবিরের বাইরে অস্থিরভাবে পাইচারি করছেন, একটি চিঠি লিখছেন, আবার বদলাচ্ছেন। এই অস্থিরতার মধ্যে নাটক আরম্ভ হচ্ছে। নাটকের মূল বিষয়ই ইফিগেনেইয়ার বলি—আহুতি।

ইফিগেনেইয়াকে নিয়ে এউরিপিদেস দুটো নাটক লিখেছেন। এই নাটকটি এউরিপিদেসের শেষ জীবনের রচনা, হয়ত শেষ রচনা। তিনি সম্ভবতঃ নাটকটি পুরোটা শেষ করতে পারেননি, পারলেও নিশ্চয়ই সংশোধন করতে পারেননি। পণ্ডিতেরা বলেছেন যে নাটকটির পাঠ বহুক্ষেত্রেই অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, কোনো কোনো জায়গায়, বিশেষ করে শেষের দিকের গ্রীক খুবই খারাপ।

এউরিপিদেসের মৃত্যুর দু'বছর পরে, ৪০৮ খ্রীঃ পূর্বাব্দে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। তখন থেকেই সম্ভবতঃ অভিনেতা-অভিনেত্রী পরিচালকদের হাতে কিছু কিছু interpolation হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা মোটামুটি একমত যে, এর পরিকল্পনা এউরিপিদেসের নিজস্ব, এর চরিত্রগুলি তাঁর মনোভঙ্গির পরিচায়ক। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এর মধ্যে এউরিপিদেসের বিশেষ লক্ষণগুলি, যেমন তিক্ততা, ধর্মের প্রতি সন্দেহ, দেশপ্রেমের মহিমার প্রতি তির্যক বিদ্রূপ, যুদ্ধের বিরোধিতা, ভাবাকুলতা—সবই প্রকাশ পেয়েছে। এউরিপিদেসের শেষ নাটক তাঁর প্রতিভার অনুপযুক্ত নয়। কিংবদন্তী আছে এই নাটকে ইফিগেনেইয়ার শেষ কথাগুলি নাকি এউরিপিদেস তাঁর মৃত্যুর সময় আবৃত্তি করেছিলেন :

হে আলোক, তুমি নিয়ে এসেছ দিনের সঙ্কেত
জেউসের উদ্ভাসিত জ্যোতি!
আমি যাত্রা করছি এক জীবন থেকে অন্য জীবনে
এক ভাগ্য থেকে অন্য অদৃষ্টে, এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে।
আলো, তুমি আমার প্রিয়। বিদায় মর্ত্যের আলো।

২

এই নাটকের বিষয়বস্তু ইফিগেনেইয়ার হত্যা। এউরিপিদেসের কাহিনীর শেষে দেখি দেবতারা ইফিগেনেইয়াকে রক্ষা করলেন। তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন তাউরিসদ্বীপে, সেখানে আর্তেমিসের মন্দিরের পূজারিনী হয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। কি করে এই দ্বীপে তিনি গেলেন, কেমন করে তাঁকে তাঁর ভাই ওরেসতেস উদ্ধার করলেন সে কাহিনী পাওয়া যাবে এউরিপিদেসের আর একটি নাটকে—তাউরিসদ্বীপে ইফিগেনেইয়া। সে নাটকটি বর্তমান নাটকের অনেক আগে লেখা হয়েছিল। আরিস্টটল সে নাটকটির বিশেষ প্রশংসাও করেছেন। যদিও 'আহুতি' আধুনিক মানুষের মনে নাড়া দেয় অনেক বেশি।

ইফিগেনেইয়ার যে কাহিনী এ নাটকে পাই, তা একটি পুরাণকথার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। গ্রীক নাট্যকারেরা সর্বদাই পুরাণকথার ভিত্তিতে নাটক গড়তেন। আরিস্টটল বলেছেন, তাঁদের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে কয়েকটি পরিবারের ইতিহাস থেকে। এই নাটকের কাহিনী এসেছে আত্রেয়ুস পরিবার থেকে। আত্রেয়ুস পরিবারের সন্তান আগামেমনোন ও মেনেলাওস। আগামেমনোনের মেয়ে ইফিগেনেইয়াকে নিয়ে এউরিপিদেস লিখেছেন দুটি নাটক। আগামেমনোনের ট্রয় থেকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর স্ত্রী ক্লুতায়মনেস্ত্রা কর্তৃক আগামেমনোনের হত্যা, এলেকত্রার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ স্পৃহা ও শেষ পর্যন্ত ওরেসতেস কর্তৃক মাতৃহত্যা, সেই পাপের দুর্দশা, সেই পাপ থেকে মুক্তি—এই ঘটনাবলী নিয়ে আয়সখুলোস লিখেছেন বিখ্যাত "ওরেস্তিয়া"। এই পরিবারের মেয়ে এলেকত্রাকে চিত্রিত করেছেন তিনজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, আয়সখুলোস, সেফোক্লেস এবং ইউরিপিদেস। এই পরিবারেরই মেয়ে ইফিগেনেইয়া। আয়সখুলোসের আগামেমনোন নাটকে ইফিগেনেইয়ার আহুতির কথার উল্লেখ আছে—বৃদ্ধদের উক্তিতে সবিস্তারে ইফিগেনেইয়ার হত্যার কথা বলা হয়েছে—কিন্তু এই কাহিনীর নাটকীয় সম্ভাবনাকে প্রথম আবিষ্কার করলেন এউরিপিদেস।

এউরিপিদেস তাঁর নিজের জীবনে দেখেছিলেন আথেন্স পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন সব যুদ্ধই আসলে ট্রয়ের যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত বিজয়ী ও বিজিত দুজনেরই পরাজয়। ট্রয় ভস্মীভূত হল, ট্রয়ের বীরেরা নিহত হল, ট্রয়ের নারীরা লুণ্ঠিত হল। কিন্তু গ্রীস তার পরিবর্তে কি পেল?

যুদ্ধজয়ের সম্মান? কিন্তু তারও শত শত বীর নিহত হল। অজস্র যুবকের মৃত্যু হল এক অপদার্থ নারীর জন্য। এউরিপিদেস "হেলেন" নাটকে আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন একথা। পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধও ট্রয়ের যুদ্ধের থেকে পৃথক নয়। যে যুদ্ধের গৌরবের জন্য আগামেমনোন তাঁর কন্যাকে উৎসর্গ করতে রাজী হয়েছেন সে যুদ্ধের গৌরব কি সত্যিই কাম্য? সমস্তটাই ফাঁপা, অর্থহীন। এইরকম অর্থহীন ছিল পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধের শৌর্য, বীর্য, গর্ব, পৌরুষ।

তবুতো মানুষ যুদ্ধ চায়। যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শক্তি লোভ, ক্ষমতা-লিপ্সা, যশের আকাঙ্ক্ষা—যাকে গ্রীকরা বলতেন: 'ফিলো-তিমিয়া'। এই ফিলোতিমিয়াই আগামেমনোনকে প্রলুব্ধ করেছিল ইফিগেনেইয়াকে হত্যা করার প্রস্তাবে রাজী হওয়ায়। যখন তিনি বুঝতে পেরেছেন এ কাজ অন্যায় তখনও শেষ পর্যন্ত আর তাঁর পক্ষে এই নিষ্ঠুরতা থেকে নিরস্ত্র হওয়া সম্ভব হয়নি। তার প্রধান কারণই হল এই যশোলোভ। সেই সঙ্গে অবশ্য তখন যুক্ত হয়েছে জনতার ভয়। জনতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৌশলী-রাজনীতিক অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করতে কুণ্ঠিত হন না। আগামেমনোনকে মেনেলাওসকে এই অভিযোগ করে ধিক্কার দিয়েছেন।

ইফিগেনেইয়া এই নাটকে প্রবেশ করেছে উচ্ছ্বসিত আনন্দের মূর্তি। বীর আখিল্লেসের সঙ্গে তার বিবাহ হবে। হঠাৎ সে জানতে পারল সব মিথ্যা। প্রথমে এই মিথ্যা, ছলনার চক্র স্পষ্ট হয়েছিল জননী ক্লুতায়মনেস্ত্রার কাছে। অপমানিতার জননীর কাছে ইফিগেনেইয়া এই মিথ্যার সংবাদ পেল। তখন তার আর্তনাদ বড়ো করুণ। সে পিতার কাছে জীবন ভিক্ষা করল বারবার—আমি মরতে চাইনা, আমি পৃথিবীর আলো ভালোবাসি, পৃথিবীর তলার অন্ধকারে যেতে চাইনা। তার জননী আগামেমনোনকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। কাতর অনুনয় করলেন। কিন্তু আগামেমনোন তখন জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর আর কোন উপায় নেই। ক্লুতায়মনেস্ত্রার কাতর অনুরোধে আখিল্লেস রাজী হলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি ইফিগেনেইয়াকে রক্ষা করবেন। এই প্রতিশ্রুতির ফলে আমাদের মনে একটা প্রত্যাশা জাগে, ইফিগেনেইয়ার নিষ্ঠুর মৃত্যু তাহলে রোধ করা যেতে পারে। অন্তত: একজন বীর আগামেমনোনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারে, অন্তত একজনের কাছে ট্রয়যাত্রার গৌরবের চেয়েও একটি মানুষের

প্রাণের মূল্য কম নয়। কিন্তু ঠিক সেই সময় দেখি ইফিগেনেইয়ার মধ্যে এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। সে স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করতে চাইছে। দেশের জন্য, গ্রীসের জন্য সে প্রাণ সমর্পণ করতে চাইছে। হঠাৎ সে অনুভব করল সমগ্র গ্রীসের মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে, তার ওপর নির্ভর করছে গ্রীসের সম্মান, তার জন্য অপেক্ষা করছে সমস্ত রণতরী, সমস্ত সৈন্য। তাই সে ঠিক করল সে দেবতার বেদীতে নিজের শরীর উৎসর্গ করবে।

ইফিগেনেইয়া যদি স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে অস্বীকার করত তাহলে আখিল্লেস তাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করত। হয়ত তার প্রাণ যেত। হয়ত আগামেমনোনের সঙ্গে যুদ্ধ হত অন্য সেনাপতিদের। অনেকেই প্রাণ হারাত। সেই কথা ভেবে ইফিগেনেইয়া নিজের মৃত্যু বরণ করল। দেশের গৌরবের জন্য হয়ত সে প্রাণ দিতে রাজি হল। কিন্তু দেশপ্রেমের উন্মাদনায় ইফিগেনেইয়া বুঝতে পারেনি যে তার মৃত্যু অনেক মৃত্যুর সূচনা। তার মৃত্যু মানেই ট্রয় যুদ্ধের সূচনা। আর ট্রয়ের পতন মানে শুধু প্যারিসের মৃত্যু নয়। হেকতোরের মৃত্যু নয়। তার মানে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু। ট্রয়ের সৈন্যদের মৃত্যু, গ্রীক সৈন্যদেরও মৃত্যু; তার মানে শুধু ট্রয়ের হাহাকার নয়, গ্রীসেরও হাহাকার। ইফিগেনেইয়া প্রথম দিকে বারবার বলেছে কেন হেলেনের জন্য তাকে মরতে হবে, কেন হেলেনের উদ্ধার মানে তার মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত ইফিগেনেইয়া আর হেলেন যেন এক হয়ে গেল নাটকের মধ্যে। আয়সখুলসের আগামেমনোন নাটকে হেলেনের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তার নাম তিনটি সর্বনাশের সংকেত-বাহী—হেলেনাস, হেলান্দ্রোস, এবং হেলেপ্‌তোলিস—জাহাজের মৃত্যু, মানুষের মৃত্যু এবং নগরীর মৃত্যু। এউরিপিদিসের ইফিগেনেইয়াও শেষ মুহূর্তে বলে উঠল আমি হেলেপ্‌তোলিস, আমি নগরীর মৃত্যু। হেলেনের মতো, নিজের অজান্তেই ইফিগেনেইয়া হয়ে উঠল ট্রয় ও গ্রীক যুদ্ধের কারণ, বলে উঠল আমি ধ্বংস করব ইলিয়োন, ট্রয় পরাজিত হবে আমার হাতে।

৩

আরিস্টটল বলেছিলেন যে ইফিগেনেইয়া নাটকে পূর্বাপর সঙ্গতি নেই। আরিস্টটল ব্যাপারটা দেখেছেন খুব সহজভাবে। যে মেয়েটি একটু আগে কেঁদে একসারা, যে বারবার অনুনয় করছিল তার প্রাণের জন্য, সে কি করে এক মুহূর্তে বদলে যায়। এই পরিবর্তন বড়ো আকস্মিক।

যে ইফিগেনেইয়া দর্শকের সামনে প্রথমে এসেছিল সে সরল, উচ্ছল, আনন্দে টলমল করছে। বাবাকে জড়িয়ে ধরেছে বালিকার মতো পরম বিশ্বাসে। আখিল্লেসের সঙ্গে বিবাহের গৌরব তাকে হরিণীর মতো চঞ্চল করে তুলেছে। কিন্তু হঠাৎ যখন সে জানতে পারল পিতার চক্রান্তের কথা, তার স্বপ্নের জগৎ মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার বিবাহের কথা মিথ্যা; মৃত্যুর ফাঁদ মাত্র। তখন সে বিহ্বল হয়ে কখনও কেঁদেছে, কখনও আর্তনাদ করেছে, পিতার কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছে। কিন্তু পিতা তার কথায় উত্তর দিতে পারেননি, তার প্রার্থনায় সাড়া দেননি, তিনি পালিয়ে গেছেন। ইফিগেনেইয়ার জীবনে সেই এক বিরাট মুহূর্ত। সামান্য যেটুকু আশা ছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল আগামেমনোনের নির্মম আচরণে। জীবনে কখনও কখনও এইরকম মুহূর্ত আসে, একটা মুহূর্তের শক্তি তখন অসামান্য। এক মুহূর্তে বালিকা বদলে যায় নারীতে, সরল বিশ্বাসী মানুষ হঠাৎ হয়ে ওঠে অভিজ্ঞ প্রবীণ। ইফিগেনেইয়ার জীবনে সেইরকম মুহূর্ত এসেছিল।

এখনও আশা আছে। আখিল্লেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রক্ষা করার। কিন্তু সেই আখিল্লেসও বিপন্ন। সৈন্যরা তার বিরোধিতা করছে। ওদুসেউস সৈন্য নিয়ে আসছে ইফিগেনেইয়াকে নিয়ে যেতে। সঙ্ঘাত অনিবার্য। অবশ্যই আখিল্লেস তার প্রতিশ্রুতি রাখবেন, তিনি একাই গ্রীক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বেন এবং প্রাণ দেবেন। ইফিগেনেইয়া নীরবে লক্ষ্য করছে সব। তার চোখে ফুটে উঠছে আখিল্লেসের বিপন্নতা। এখন সে আর বালিকা নয়, সে প্রাজ্ঞ। সে পিতার কাছে আশ্রয় পায়নি, সে বুঝতে পারছে তার জন্য যুদ্ধ আসন্ন, তার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না, আখিল্লেসও না। সেই মুহূর্তে সে বলে উঠল—সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে প্রাণ আহুতি দেবে। এখন তার নতুন মূর্তি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন সে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছে। সে এখন সমগ্র গ্রীসের জন্য আত্মনিবেদন করতে প্রস্তুত। তার সিদ্ধান্ত ভুল কি ঠিক তা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু তার এই পরিবর্তনের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই।

তবু বেদনা এই যে ইফিগেনেইয়ার আহুতির পেছনে যতই দেশপ্রেমের উন্মাদনা থাক, একটা অসহায়তাও আছে। সে অনিবার্যকেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু পুরোটা কি মেনেছে। রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে সে প্রবল আর্তনাদে। আর দূত এসে যখন তার মাকে বলেছে দেবতারা ইফিগেনেইয়াকে আশ্রয় দিয়াছেন, ক্লুতাইমনেস্ত্রা বিশ্বাস করেনি, ভেবেছে তাকে সান্ত্বনা

দেবার জন্য বুঝি কোনো উপকথা তৈরী করা হয়েছে। এইরকম সন্দেহ সোফোক্লেস করতেন না। পুরাণ তাঁর কাছে সত্য। এউরিপিদেস পুরাণের কথায় নিজের কথা বলেছেন, তাই তার সন্দেহ। আগামেমনোন যখন ক্লুতাইম্‌নেস্ত্রার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে, তখন অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে তিনি স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ঘৃণায়, তিনি জানেন যে হেলেনের জন্যই তাঁর কন্যা নিহত। আর এউরিপিদেস যে গ্রীসের জন্য এই নাটক রচনা করেছিলেন সেই গ্রীস কি একেবারেই বোঝেনি যে যুদ্ধ মানেই অপচয়, প্রাণের বিনষ্ট, মহৎ প্রাণের আহুতিও যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ঢাকতে পারে না।

লোকে বলে এউরিপিদেসের জন্ম হয়েছিল চারশ আশি সালের সেইদিনে যেদিন গ্রীস সালামিসের যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। পিতামাতা তাঁর নামের সঙ্গে গ্রীক জয়গৌরবের স্মৃতি জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। গ্রীসের মূলভূমি ও এউবোয়েয়ার মধ্যবর্তী যোজকের নাম এউরিপুস। এইখানে গ্রীক-পারশ্যযুদ্ধে অসমসাহসিকতা দেখিয়েছিল গ্রীক সৈন্যেরা। ভাগ্যের পরিহাস, যাঁর নামের সঙ্গে জড়ানো আছে গ্রীক যুদ্ধের স্মৃতি, যাঁর জন্ম হল সালামিসে গ্রীসের বিজয়ের দিনে—এই যুদ্ধে আয়সখুলস ছিলেন সৈনিক, বিজয় উৎসবের শোভাযাত্রায় গান গেয়েছিলেন বালক সোফোক্লেস—সেই এউরিপিদেসের নাটকে ধ্বনিত হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার। তাঁর ট্রয়ের নারী নাটকে যুদ্ধের যে সর্বনাশা শূন্যতা, যে অমানবিক ব্যর্থতার ছবি আছে তার তুলনা আর কোথায়। 'আহুতি' কালগত দিক থেকে না হলেও, ভাবগত দিক থেকে, ট্রয়ের নারীর পূর্ব ইতিহাস। ইফিগেনেইয়ার আহুতির ফলেই আগামেমনোনের সৈন্যরা জাহাজ ভাসাতে পারল সমুদ্রে। তারা ট্রয়ের দিকে যাত্রা করল।

চরিত্রলিপি

আগামেমনোন : আর্গোসের রাজা, গ্রীক সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক একজন আগামেমনোনের বৃদ্ধ ক্রীতদাস।

কোরাস : খালকিসের নারীর দল, আউলিসে গ্রীক জাহাজ দেখতে এসেছে।

মেনেলাওস : হেলেনের স্বামী, আগামেমনোনের ভাই, স্পার্টার রাজা।

ক্লুতাইম্‌নেস্ত্রা : আগামেমনোনের স্ত্রী, হেলেনের বোন।

ইফিগেনেইয়া : আগামেমনোনের কন্যা।

আখিল্লেস : সমুদ্রদেবী থেতিসের সন্তান, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীকবীর।

দূত ১ম

দূত ২য়

শিশু ওরেসতেস

দেহরক্ষীর দল

ক্লুতাইম্‌নেস্ত্রার সহচরীরা

প্রহরীর দল

[আউলিসে গ্রীক সৈন্যরা তাঁবু ফেলেছে সমুদ্রতীরে। সামনে আগামেমনোনের শিবির। শিবিরে প্রবেশের দ্বার দেখা যাচ্ছে। এছাড়া দুদিকে আরো দুটি দ্বার। এখনও রাত্রির অন্ধকার। আগামেমনোন অস্থির-ভাবে পায়চারি করছেন। তাঁর হাতে লেখনী এবং মোমলাগানো কাঠের ফলক। হঠাৎ তিনি কি চিন্তা করে প্রথম দরোজার সামনে এসে তাঁর ক্রীতদাসকে ডাকলেন]

আগা ॥ বৃদ্ধ, এখানে এসো, আমার শিবিরের সামনে।

বৃদ্ধ ॥ আসছি, কোনো নতুন ব্যাপার নাকি।

আগা ॥ তাড়াতাড়ি এসো।

বৃদ্ধ ॥ আসছি, আসছি। (রঙ্গমঞ্চে ঢুকতে ঢুকতে) আমি কিন্তু ঘুমোইনি। বার্ধক্যের এই ফল, চোখ আর বন্ধ হয় না।

আগা ॥ ওটা কোন্ নক্ষত্র? রাত কত হোল?

বৃদ্ধ ॥ লুব্ধক। সাতভাই তারার পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে এখনও মধ্য আকাশে।

আগা ॥ কোথাও পাখির শব্দ নেই, সমুদ্রের শব্দ নেই। এউরিপোস সমুদ্রের ওপরও বাতাস স্তব্ধ।

বৃদ্ধ ॥ শুধু তুমি শিবিরের বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছ। কেন? রাজা আগামেমনোন?
সমস্ত আউলিস নিদ্রামগ্ন, প্রাচীরে ওপর প্রহরীদের আনাগোনাও বন্ধ। তুমি এখনও ভেতরে যাওনি কেন?

আগা ॥ বৃদ্ধ, তোমাকে আমার ঈর্ষ্যা হয়। যাদের জীবন বিঘ্নহীন, শান্ত, অজ্ঞাত, যশ গৌরবহীন, তাদের ঈর্ষ্যা করি।
যারা যশস্বী, প্রতিষ্ঠাবান, তাদের প্রতি কোনো ঈর্ষ্যা নেই আমার।

বৃদ্ধ ॥ কিন্তু তাদের জন্যইতো পৃথিবীর সব সুখ, সব সম্মান!

আগা ॥ সম্মান? তাই বটে। সেই সুখ আর সম্মান বড়ো বিপজ্জনক। প্রথমে তাদের স্বাদ বড়ো মধুর, কিন্তু পরিনামে তারা তিক্ত দুঃখ।
একদিন দেবতার কাজে মানুষের ত্রুটি ঘটে, আর এক নিমেষে বদলে যায় তার জীবন। মানুষের ইচ্ছাও বড়ো বিচিত্র, বড়ো বিরোধী, তাই সব কিছু ভেঙে তছনছ হয়ে যায়।

বৃদ্ধ ॥ তোমার মতো একজন সম্ভ্রান্ত বীরের মুখে এসব কথা আদৌ মানায় না। তোমার পিতা আত্রেউস তোমাকে

একটি কুসুমাস্তীর্ণ পৃথিবীতে জন্ম দেননি জানি। কিন্তু রাজা আগামেমনোন, তুমিতো জানো, পৃথিবীতে সুখ আছে, আর দুঃখও থাকবে। এই হল মানুষের ভাগ্য। এই হল দেবতাদের অভিপ্রায়।
কিন্তু তোমার শিবিরে এখনও আলো কেন? তোমার হাতে লেখার জন্য ফলক, একবার মোহর লাগিয়েছ, একবার খুলেছ, আবার লিখেছ; লেখনী ফেলে দিয়েছ মাটিতে, তোমার চোখে জল, যেন কোনো এক দুঃসহ দুঃখ তোমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে। রাজা আগামেমনোন, কি হয়েছে তোমার? আমাকে সব বল। আমি তোমার ভৃত্য, আমাকে বিশ্বাস করে সব বল। তোমার মনে আছে, তুন্দারেউস্, তোমার বিবাহের সময় তোমার পত্নীর ভৃত্যরূপে যৌতুক পাঠিয়েছিলেন আমাকে তোমার কাছে।

আগা ॥ থেস্তিওসের কন্যা লেদা, তাঁর তিন কন্যা, ফোইবে ক্লুতাইমনেস্ত্রা, আমার স্ত্রী, আর হেলেন। হেলেনকে বিবাহ করার জন্য এসেছিল গ্রীসের শ্রেষ্ঠ যুবকেরা, তাদের মধ্যে আরম্ভ হল প্রবল বিরোধ। যদি কোনো এক যুবককে হেলেনের জন্য সেদিন মনোনীত করা হত, তাহলে প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীদের হাতে তাঁর মৃত্যু ছিল নিশ্চিত।
হেলেনের পিতা তুন্দারেউস্ চিন্তাকুল মনে বিবেচনা করছিলেন আদৌ হেলেনের বিবাহ দেবেন কিনা, ভাবছিলেন কি করে এই সংকটের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হঠাৎ তাঁর মনে এক সমাধানের উদয় হল।
প্রণয়ীদের সকলকে দেবতাদের উদ্দেশে আয়োজিত যজ্ঞে যোগ দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে যুবক হেলেনকে লাভ করবে, তাকে সকলে মিলে রক্ষা করবে, যদি কেউ তাকে অপহরণ করে, তার স্বামীর শয্যা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সে গ্রীসের মানুষ হোক, কিংবা বিদেশী, সকলে মিলে তার নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, তাকে হত্যা করবে। তারা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিল।

বৃদ্ধ তুন্দারেউস ছিলেন অত্যন্ত চতুর। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর, তিনি নিজের কন্যার ওপর ছেড়ে দিলেন পতি নির্বাচনের দায়িত্ব। আফ্রোদিতের মধুর নিঃশ্বাস তাকে নির্দেশ দেবে, তাঁরই আদেশে হেলেন বেছে নেবে তার স্বামী। এক কুলগ্নে সে নির্বাচন করল মেনেলাওসকে। আমার ভাই মেনেলাওস।

তারপর একদিন ফ্রুগিয়া থেকে এল এক যুবক লাকেদাইমোনে। লোকশ্রুতি, সে নাকি দেবীদের সৌন্দর্য বিচার করেছিল। তার পোশাকে লাগানো ছিল সোনার ফুল, তার শরীরে ঝলমল করছিল সোনায় মোড়া বিদেশী অলঙ্কার। হেলেন তার প্রেমে পড়ল।

মেনেলাওস যখন ঘর থেকে দূরে তখন সে একদিন হেলেনকে নিয়ে পালাল ইদার সবুজ প্রান্তরে।

ক্রোধে অন্ধ মেনেলাওস অধীর উত্তেজনায় ঘুরে বেড়াল সমস্ত গ্রীস, সকলকে মনে করিয়ে দিল তাদের প্রতিশ্রুতি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের সম্মিলিত সাহায্যের শপথ। প্রস্তুত হল সমস্ত গ্রীস রণসাজে।

তাই আজ তারা উপস্থিত এই আউলিস সমুদ্রের তীরে। তাদের রণতরী, তাদের বর্ম, তাদের রথ, তাদের অশ্ব, তাদের সৈন্যদল। আর আমি যেহেতু মেনেলাওসের ভাই, তাই আমাকে তারা করেছে সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ। অন্য কাউকে এই দায়িত্ব দিলেই বোধ হয় ভালো হত।

যখন সৈন্যদল একত্রিত হল আউলিস সমুদ্রের ধারে, হঠাৎ তখন বাতাস পড়ে গেল, আমাদের গতি হল বন্ধ। আমাদের দৈবজ্ঞ কালখাস জানালেন, আমার কন্যা ইফিগেনেইয়াকে যদি এখানকার দেবী আর্তেমিসের কাছে বলি দেওয়া হয়, তাহলে, শুধু তাহলেই আবার অনুকূল হাওয়া বইবে, আমরা পৌঁছতে পারব ফ্রুগিয়ায়, ট্রয়ে, সেই নগরীর পতন হতে পারবে আমাদের হাতে।

যখন একথা আমি শুনলাম, আমি আমাদের ঘোষক তাল-থুবিয়োসকে বললাম, তোমার ভেরী বাজিয়ে প্রচণ্ড নির্ঘোষে

এখনই ঘোষণা করে দাও, সৈন্যরা নিজের নিজের দেশে ফিরে যেতে পারে, আমি কিছুতেই আমার কন্যাকে হত্যা করতে পারব না।

কিন্তু আমার ভাই, মেনেলাওস, আমাকে অনুরোধ করতে লাগল বারবার। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে সে আমাকে সম্মত করাল। আমি চিঠি লিখলাম আমার স্ত্রীকে, আমার মেয়েকে এইখানে পাঠিয়ে দাও, আখিল্লেসের সঙ্গে তার বিবাহ দোব। আমি সবিস্তারে আখিল্লেসের গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছি। লিখেছি, যদিনা আমাদের পরিবারের একটি কন্যা তার বধূ হয়ে তার ঘরে যায়, সে যুদ্ধ করবে না। সবই মিথ্যে কথা লিখেছি, যাতে আমার স্ত্রী আমার মেয়েকে নিয়ে এখানে চলে আসেন। গ্রীকদের মধ্যে এই ব্যাপার জানে শুধু তিনজন, কালখাস, ওদুস্‌সেউস্ আর মেনেলাওস।

কিন্তু আমি যা করেছি তা অন্যায়। আমি এখন তার প্রতিকার করতে চাই। সেইজন্য আবার চিঠি লিখছি। রাত্রির অন্ধকারে সেই চিঠি বারবার লিখছি আর বারবার বদল করছি। তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ, বৃদ্ধ।

এই নাও চিঠি। তোমাকে দ্রুত যেতে হবে আর্গোসে। তুমি আমার স্ত্রীর বিশ্বস্ত, তুমি আমার অনুগত। শোন, এই চিঠিতে কি লিখেছি।

বৃদ্ধ ॥ বেশ, বল, তাদের চিঠির নির্দেশ আমি মুখেও বলতে পারি।

আগা ॥ (চিঠি পড়ে) প্রিয় ক্লুতাইম্‌নেস্ত্রা আমার এই চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কোর, আগের চিঠিটি অগ্রাহ্য কোর। তুমি এউবোইয়ার উন্মুক্ত বন্দরে তরঙ্গহীন আউলিসে তোমার মেয়েকে পাঠিও না। আমাদের সন্তানের বিবাহ এখন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রইল।

বৃদ্ধ ॥ কিন্তু আখিল্লেস? তাকে ভোলাবে কি করে? সে যখন এই কথা শুনবে তখন তার প্রচণ্ড ক্রোধ ধাবিত হবে তোমার প্রতি, তোমার স্ত্রীর প্রতি। সে এক ভীষণ বিপর্যয় হবে। সে কথা ভেবেছ কি?

আগা ॥ আমি তো শুধু তার নাম ব্যবহার করেছি। আমার কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ নিয়ে চক্রান্তের কথা সে তো কিছুই জানে না।

বৃদ্ধ ॥ কিন্তু বড়ো দুঃসাহসের কাজ করেছ, রাজা আগামেমনোন। দেবতার সন্তান, আখিল্লেসের সঙ্গে বিবাহের ছলনায় তুমি আর্গোস থেকে তোমার মেয়েকে আনতে চেয়েছ তাকে হত্যা করার জন্য ?

আগা ॥ আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। আমি এখন ধ্বংসের শেষ সোপানে। আর দেরী নয়, বৃদ্ধ, আর দেরী কোর না, এখনই যাও। দ্রুতগতিতে যাও, আজ বার্ধক্যের দোহাই দিও না।

বৃদ্ধ ॥ আমি অবিলম্বে যাত্রা করছি।

আগা ॥ কোনো ছায়াচ্ছন্ন ঝর্ণার ধারে বিশ্রাম করবে না, কোথাও নিদ্রা যাবে না, দ্রুত যেতে হবে—

বৃদ্ধ ॥ (আহত স্বরে) একথা কি করে বলছ তুমি, ছিঃ, ছিঃ।

আগা ॥ যাবার সময় যেখানে দেখবে রাস্তা দুভাগ হয়ে দুই দিকে চলে গেছে, সেখানে সাবধানে লক্ষ্য কোর যেন কোনো রথ তোমার অলক্ষিতে আমার কন্যাকে নিয়ে যেন গ্রীক শিবিরের দিকে না আসতে পারে।

বৃদ্ধ ॥ তাই হবে।

আগা ॥ আর যদি সে আমার অন্তঃপুর থেকে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়ে থাকে, যদি তার সহচরদের সঙ্গে কিংবা তারই সঙ্গে দেখা হয়, তুমি তাদের ফিরে যেতে বলবে। তুমি নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরবে, তীব্রগতিতে ফিরে যাবে আমার রাজ্যে, কুকলোপাসের তৈরী বিখ্যাত আর্গোসে।

বৃদ্ধ ॥ কিন্তু তোমার পত্নী ও কন্যা কি আমার কথায় বিশ্বাস করবে ? কি করে জানবে তারা যে এই হচ্ছে তোমার নির্দেশ ?

আগা ॥ এই নাও মোহরাঙ্কিত পত্র, যত্ন করে রাখো। এইবার বেরিয়ে পড়। সূর্যের অগ্নিরথের চিহ্ন দেখা দিচ্ছে আকাশে। আমার বড়ো দুঃসময়। সাহায্য কর আমায়।

[বৃদ্ধের প্রস্থান]

কোনো মানুষই জানেনা কিসে যে তার সুখ, কিসে তার কল্যাণ। মানুষের সমস্ত জীবনটা দুঃখ দিয়ে ঘেরা। কোনো নিস্তার নেই দুঃখের হাত থেকে।

[আগামেমনোনের প্রস্থান। প্রবেশ করে খালকিস নগরীর যুবতীদের দল।]

কোরাস ॥ সমুদ্রপথ দিয়ে
আউলিসের বালুকা বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে
আমরা এসেছি

এউরিপোসের সংকীর্ণ জলপথে
আমরা দাঁড় টেনেছি নৌকার

আরথৌসার সমুদ্রগামিনী ঝর্ণাগুলির ধাত্রী
আমাদের নগরী খালকিস
আমাদের সেই নগরীকে পেছনে রেখে
আমরা দেখতে এসেছি
গ্রীক সৈন্যবাহিনী
গ্রীকদের জাহাজ।

আমাদের স্বামীদের মুখে শুনেছি
গ্রীকবীরেরা সহস্র রণতরী নিয়ে চলেছে
সুকুন্তল মেনেলাওস ও মহান আগামেমনোনের নেতৃত্বে
হেলেনের সন্ধানে। শুনেছি
মেষপালক প্যারিস শরবনে ঢাকা এউরোতাস নদীর
তীর থেকে হেলেনকে নিয়ে গেছে তার দেশে।
প্যারিস একদিন শিশিরে ভেজা কুপ্রিয়া পাহাড়ের
ওপর হেরা-পাল্লাস আফ্রোদিতে এই তিন দেবীর
সৌন্দর্যের বিচার করেছিল
তার পুরস্কার হেলেন
আফ্রোদিতের উপহার।
পথে দেখেছি
আর্তেমিসের পবিত্র বেদী
কত পশু বলি দেওয়া হয়েছে ঐ বেদীতে

তার পাশ দিয়ে কুঞ্জবনের পথ ধরে
আমরা এসেছি
এসেছি সংকোচে, শঙ্কায়, মুখে আমাদের লজ্জার রক্তরাগ,
দেখতে এসেছি এই বিপুল সৈন্যদল।
শিবিরের পর শিবির
আর অসংখ্য অশ্বের দল।

ঐ যে, দেখতে পাচ্ছি ওদের
ওদের নাম আইয়াস, ওরা সালামিসের গর্ব॥

আমি দেখতে পাচ্ছি প্রোতেসিলাউসকে
আর পোসেইদোনের মেয়ের ছেলে পালামেদেনকে।
ওরা বসে আছে, খেলছে
বাঘবন্দী খেলার চালের চিন্তায় বিভোর।

ঐ ছাখো, দূরে দিত্তমেদে, চাকার খেলায় মত্ত।
তার কাছেই মেরিয়োনেস, আরেসকুলের রত্ন,
নরলোকে বিস্ময়।

ঐ তো লায়েতেসের বীর পুত্র। এসেছেন এক
পার্বত্য দ্বীপ থেকে।
আর, ঐ নিরেউস,
সবচেয়ে সুন্দর গ্রীক

আমি দেখতে পাচ্ছি
দ্রুতগামী আখিল্লেসকে,
বাতাসের চেয়েও জোর ওর ছুটি পায়ে।
আখিল্লেস, থেতিসের পুত্র
খেইরোনের শিষ্য।
ঐ ছাখো, সারা শরীর ভরা অস্ত্র,
পাথরের টুকরো ছড়ানো সমুদ্রতীরে চার অশ্বের রথের সঙ্গে
দৌড়ের পাল্লা দিচ্ছেন বীর।
কি সুন্দর ঘোড়া, ওদের মুখে সোনালি লাগাম।

মাঝের ঘোড়া দুটির কেশরে আবার সাদার ছোঁয়া
আর পাশের দুটির গোড়ালির পেছনে সাদা-কালো চুল,
সারথি এউমেলোস বসেছে রথে
চিৎকার করছে, অঙ্কুশ দিয়ে তাড়া দিচ্ছে
কেমন সুন্দরভাবে চারটি ঘোড়া একই সঙ্গে সার বেঁধে
বাঁক নিচ্ছে
আর পেলেউসের পুত্র বীর আখিল্লেস তাদেরও আগে
পৌঁছে গেলেন রথের চক্রচিহ্নিত পথের ধারে

আর যেখানে নৌকো বাঁধা
সে এক অপূর্ব দৃশ্য
সে যে কি আশ্চর্য!
দক্ষিণে দেখলাম মুরমিদোনের নৌবহর
পঞ্চাশটি ক্ষিপ্রতরী, প্রত্যেকটির গলুইতে দেবী নেরেইদের
স্বর্ণমূর্তি, আখিল্লেসের অভিজ্ঞান।
পাশেই আরগিতের রণতরীর সারি
তাদের নায়ক মেকিস্‌তেউস্‌,
তাঁর সঙ্গে আছেন কাপানেউসের সন্তান স্থেনেলোস।
তার পাশে আত্তিকার ষাটটি জাহাজ
থেসেউসের পুত্র তাদের অধিপতি।
তাদের অভিজ্ঞান হল
পক্ষীরাজ ঘোড়ায় টানা রথে আসীনা
দেবী পাল্লাস্‌ আথেনী
নাবিকদের প্রিয় দেবী প্রতিমা।

আমরা দেখেছি বোইয়োতিয়া থেকে আগত
পঞ্চাশটি সমুদ্রগামিনী তরী
প্রত্যেকটির গলবাহিকায় তাদের পবিত্র চিহ্ন
সোনার ডাগনধারী কাদমুস।
পৃথিবী গর্ভজাত লেইতোস তাদের অধ্যক্ষ।

আরো অর্ধশত তরী এসেছে লোক্রিস থেকে
ওইলেয়ুসের পুত্রের নেতৃত্বে।
কুকলোপাসের তৈরী মুকেনায় নগরী থেকে
এসেছেন আত্রেয়ুসের পুত্ররা
একশত রণতরী নিয়ে,
বিদেশী যুবকের সঙ্গে
বধূ হেলেন পলাতকা
তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছেন তাঁরা।
আমরা দেখেছি নেস্তোর যে রণতরী এনেছেন
পুলোস থেকে
তাদের অভিজ্ঞান হল নদী আলফেউস
বৃষের প্রতিমারূপে চিহ্নিত সেই প্রমত্তা নদী।

তার পাশেই শায়িতা রাজা গৌনেয়ুসের দ্বাদশটি তরী
তার পাশে লোকে যাদের এপিইয়ান বলে, সেই এলিস
উপজাতির দলপতির তরীগুলি সমুদ্রের বুকে স্থির,
তাদের চালক এউরুতোস

তাদের পাশে তাফিয়ানদের সাদা দাঁড়ের যুদ্ধজাহাজ,
ওদের অধিপতি ফুলেয়ুসের রাজা মেলেস,
তিনি এসেছেন বিপদসঙ্কুল নাবিকের ত্রাস এথিনাই দ্বীপ থেকে।
বাঁ দিকে যেখানে তরী শ্রেণীর শেষ
সেইখানে রয়েছে
সালামিস-এর বীর আইয়াসের
দ্বাদশটি সুঠাম সুন্দর নৌকাগুলি।

আমরা এইসব দেখেছি
এদের কথা শুনেছি
কত জাহাজ, জাহাজের পর জাহাজ
মনে হয়না এরা একদিন যুদ্ধশেষে ঘরে ফিরবে।
কত বীরকে দেখলাম

কত বীরের কথা শুনলাম
এদের কথা মনে থাকবে সারাজীবন।

[মেনেলাওস এবং বৃদ্ধের কলহ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ।]

বৃদ্ধ ॥ অন্যায়, মেনেলাওস, এ অত্যন্ত অন্যায়।
মেনে ॥ চুপ। বড় বেশি প্রভুভক্ত হয়েছো।
বৃদ্ধ ॥ এ তিরস্কার আমার পুরস্কার।
মেনে ॥ বাড়াবাড়ি করলে কপালে দুঃখ আছে।
বৃদ্ধ ॥ আমার হাত থেকে চিঠি কেড়ে নেওয়াই তো বাড়াবাড়ি।
মেনে ॥ গ্রীক স্বার্থের বিরুদ্ধে এই চিঠি নিয়ে যাচ্ছ।
বৃদ্ধ ॥ সে তর্ক আমার সঙ্গে নয়। আমাকে চিঠিটা দাও।
মেনে ॥ না, চিঠি আমি দেব না। চলে যাও।
বৃদ্ধ ॥ তাহলে আমিও যাব না।
মেনে ॥ তরবারির একটা আঘাতে মাথাটা নামিয়ে দোব।
বৃদ্ধ ॥ প্রভুর জন্য মৃত্যু গৌরবের।
মেনে ॥ ছোটো মুখে বড়ো কথা। যাও, যাও।

[মেনেলাওস বৃদ্ধকে আঘাত করে। বৃদ্ধের আর্তনাদ শুনে আগামেমনোনের প্রবেশ।]

বৃদ্ধ ॥ প্রভু, আমি, আমাকে আক্রমণ করেছেন—এই যে—মেনেলাওস আমার হাত থেকে চিঠি ছিনিয়ে নিয়েছেন। আগামেমনোন, এর কোনো ন্যায়-অন্যায় বোধ বিবেচনা নেই।
আগা ॥ কি ব্যাপার? আমার শিবিরের সামনে এত কোলাহল কেন? কি নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা?

[বৃদ্ধ কিছু বলতে চায়। কিন্তু মেনেলাওস তাকে থামিয়ে দেয়।]

মেনে ॥ ওর কথা নয়, আমার কথা শোন।

[আগামেমনোনের নির্দেশে বৃদ্ধ দ্বিধাগ্রস্তভাবে চলে যায়।]

আগা ॥ মেনেলাওস, এই বৃদ্ধ ক্রীতদাসের সঙ্গে তোমার আবার কলহ কেন? হঠাৎ ওকে তুমি আঘাত করলে কেন?
মেনে ॥ আমার দিকে তাকাও। তারপর সব বলছি।
আগা ॥ তুমি কি ভাবছ আমি তোমার দিকে তাকাতে ভয় পাব। আমি নির্ভীক আত্রেয়ুসের পুত্র।

মেনে ॥ এই চিঠিটা দেখছ ? বিশ্বাসঘাতকতা !

আগা ॥ চিঠি ! ওঃ, চিঠি ! আগে আমাকে ফেরত দাও।

মেনে ॥ আগে আমি গ্রীকদের কাছে এ চিঠি দেখাব। তারপর।

আগা ॥ তার মানে এই চিঠি তুমি পড়েছ। যে ব্যাপারে তোমার কোনো অধিকার নেই, সেই—

মেনে ॥ এই চিঠি আমি অবশ্যই পড়েছি, তোমার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলেছি। এর জন্য তোমাকে দুঃখ পেতে হবে।

আগা ॥ কোথায় পেলে ঐ বৃদ্ধকে ? জেউস, কী সীমাহীন ঔদ্ধত্য ?

মেনে ॥ আমি তোমার কন্যার আগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

আগা ॥ কেন ? আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার এই অভদ্র গুপ্তচর-বৃত্তি কেন ?

মেনে ॥ আমার ইচ্ছে। আমি তো তোমার ক্রীতদাস নই।

আগা ॥ অসহ্য স্পর্ধা, নিজের বাড়ির প্রভুত্বের অধিকারও আমার নেই।

মেনে ॥ না। সব সময় দেখেছি কুটিল পথে তোমার আনাগোনা—বর্তমানে, অতীতে, সম্ভবত ভবিষ্যতেও। আমি তোমাকে আর বিশ্বাস করি না।

আগা ॥ অন্যায় অভিযোগে তুমি খুবই নিপুণ। চতুর বাক্ বিস্তার আমি ঘৃণা করি।

মেনে ॥ আর আমি ঘৃণা করি অস্থিরমতিত্ব। কারো প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই, কিছুতেই তোমার আনুগত্য নেই।

তোমার অপরাধ আমি প্রমাণ করব। আমি কোনো অবিচার করতে চাই না, কিন্তু সত্য গোপন করার চেষ্টা করব না।

তোমার কি মনে পড়ে ট্রয়ের অভিযানে তুমি গ্রীক সৈন্যদের সর্বাধিনায়ক হবার প্রবল উচ্চাশা গোপনে গোপনে পোষণ করছিলে ? অবশ্য তুমি ভান করেছিলে যেন তোমার কোনো ইচ্ছেই নেই। সেদিন কত নীচে নেমেছিলে মনে আছে ? প্রত্যেকটি লোকের হাত ধরেছিলে। সেদিন নগরীর প্রত্যেকটি লোকের জন্য তোমার দ্বার ছিল মুক্ত। ইচ্ছে করুক আর না করুক প্রত্যেকের সঙ্গে সেদিন হাসিমুখে কথা বলেছ, জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য প্রত্যেককে তোষামোদ করেছ।

কিন্তু যেই তুমি নায়কপদ পেলে, অমনি তোমার সুর গেল বদলে। তোমার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল না। এবার তোমার সঙ্গে কথা বলা ভার হল, তোমার দ্বার হল রুদ্ধ, তোমার দর্শন মেলাই হল কঠিন।

একজন সৎ লোক যখন উচ্চপদপায়, তখন তার স্বভাব বদলায় না। সেই তো যথার্থ সময় যখন তার বন্ধুরা তার ওপর নির্ভর করতে পারে, তার সৌভাগ্যের দিনেই সে বন্ধুদের সাহায্য করতে পারে সবচেয়ে বেশি। তোমার বিরুদ্ধে এই আমার প্রথম অভিযোগ।

তারপর যখন তুমি সমগ্র গ্রীকবাহিনী নিয়ে আউলিসে এলে, যখন অনুকূল বাতাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তুমি পৌঁছুলে অধঃপতনের চরম সীমায়। বিধাতার অভিপ্রায় জানার পর তুমি ভয়ার্ত হয়ে উঠলে। সৈন্যরা তীব্র স্বরে দাবী জানাল, তাদের রণতরী ফিরে যাক স্বদেশে, আউলিসের নিষ্ফলা বিশ্রাম থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক। সেদিন তোমার মুখ কী মলিন হয়ে উঠেছিল। সহস্র রণতরী নিয়ে তুমি প্রায়ামের নগরে পৌঁছতে পারবে না এই ভেবে কী গভীর দুঃখে ভরে গিয়েছিল তোমার মন ! সেদিন তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে। একদিকে নায়কত্ব, অন্যদিকে বিরাট গৌরবের সম্ভাবনা যাতে না হারায় তারজন্য সব কিছুই করতে তুমি প্রস্তুত ছিলে।

যখন কালখাস বলেছিলেন দেবতার বেদীতে তোমার কন্যা ইফিগেনেইয়াকে আহুতি দিলে তবেই গ্রীক সৈন্যদের সমুদ্র যাত্রা সম্ভব, তখন কিন্তু তুমি মনে মনে খুশী হয়েছিলে, অঙ্গীকারও করেছিলে অবিলম্বে। নিজের ইচ্ছায় তুমি তোমার স্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়েছিলে—কেউ তোমাকে বাধ্য করেনি, একথা স্বীকার কর আগামেমনোন, তুমি আখিল্লেসের সঙ্গে বিবাহের অছিলায় তোমার কন্যাকে আনতে নির্দেশ দিয়েছিলে।

তারপর তুমি মত বদলেছ, তুমি আলাদা চিঠি পাঠাচ্ছিলে, এমন সময় ধরা পড়েছ।

তুমি তোমার কন্যাকে বলি দিতে চাও না। বেশ। এই আকাশ তোমার আচরণের সাক্ষী। অসংখ্য মানুষের অভিজ্ঞতা এই রকমই :

ক্ষমতা লাভের জন্য একদিন তারা অবিরাম পরিশ্রম করে, তারপর নির্লজ্জভাবে ক্ষমতা হারায়। কখনও কখনও জনতা বুঝতে পারে না, কিন্তু প্রায়ই নেতারা জনতার স্বার্থ, দেশের স্বার্থ রক্ষার অযোগ্য। আমার দুঃখ হয় গ্রীসের জন্য। গ্রীস এক মহৎ গৌরবের স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু আজ থেকে সে হবে বিদেশীর উপহাসের পাত্র। কারণ তুমি আর তোমার কন্যা।

শুধু বীরত্বের জন্য, বিচক্ষণতার জন্য আমরা আর কাউকে দেশের নেতা করব না, নেতা হবেন তিনি যাঁর মস্তিষ্ক আছে, বিবেক আছে।

কোরাস॥ বড়ো ভয়ঙ্কর এই ভ্রাতৃবিরোধ
কথায় কথায়
বাদে প্রতিবাদে
ঘনিয়ে আসে প্রবল সংঘর্ষ।

আগা॥ এবার আমার বলার পালা। আমি নির্দয় হতে চাইনা তোমার প্রতি, অভদ্রতা করতে চাইনা। ভদ্রলোকে সদয় হয়েই থাকে। তাই বলছি তুমি আমার ভাই, সহোদর, বল, কেন এই ক্রোধান্ধ উচ্চকণ্ঠ? কেন এই রক্তবর্ণ মুখ? কে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে? কি চাই তোমার?

তুমি কি এক সতীলক্ষ্মী স্ত্রীর জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছ? তাহলে অবশ্য আমি বিশেষ সাহায্য করতে পারব না। তুমি যে তোমার স্ত্রীকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারনি সেজন্য কি আমাকে তোমার অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? আমিতো তার জন্য দায়ী নই। আমার উচ্চাশায় তুমি পীড়িত বোধ করছ। কিন্তু আদৌ তা সত্য নয়। আসলে তুমি বিচার বিবেচনা শালীনতা সব বিসর্জন দিয়েছ। একটি সুন্দরী রমণীকে তোমার বক্ষলগ্ন করে রাখাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অধঃপতিত মানুষ আর তার অধঃপতিত কামনা।

আমি একটি ভুল করেছিলাম, এখন যদি সেই ভুল সংশোধন করতে চাই সেটা কি অস্থিরমতিত্ব? সেটা কি পাগলামি? বরং তুমিই উন্মাদ। দেবতারা তোমাকে এক নষ্টা নারীর হাত

থেকে মুক্তির সুযোগ করে দিয়েছেন, কিন্তু তুমি তাকেই ফিরে পেতে চাও।

ঠিকই, হেলেনের বিভ্রান্ত প্রেমিকেরা আবেগভরে হেলেনকে পাবার জন্য তুনদারেওসের কাছে একটি প্রতিজ্ঞা করেছিল। তারা ঐ প্রতিজ্ঞা করেছিল এক দেবীর প্ররোচনায়, সে দেবীর নাম আশা। তাতে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই।

তবু, চালনা কর তাদের। তারা অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করবে, কারণ তারা নির্বোধ। কিন্তু দেবতারা তো নির্বোধ নন। তাঁরা জানেন কোন্‌টা অন্যায় চুক্তি, কোন্‌টা ভয় দেখিয়ে আদায়-করা প্রতিশ্রুতি।

আমি আমার সন্তানকে হত্যা করব না। একটা অপদার্থ স্ত্রী-লোকের জন্য সংগ্রাম করে তুমি গৌরব অর্জন করবে, আর আমি নিজের সন্তানের প্রতি অন্যায় অপরাধ করে দিনরাত্রি চোখের জলে ভাসব? এটা কি সংগত?

এই আমার বক্তব্য, সংক্ষিপ্ত, সরল, আশা করি বোধগম্য। তবু যদি না মানতে চাও মেনোনা। কিন্তু আমি আমার বিবেচনা মতই কাজ করব।

কোরাস॥ অবশ্যই তুমি আগের প্রতিশ্রুতি থেকে
বিচ্যুত হয়েছ।
তবু এই ভালো,
সন্তানের মঙ্গলের জন্য
এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ।

মেনে॥ আমারই দুর্ভাগ্য, আমি সত্যিই বন্ধুহীন।

আগা॥ তোমার বন্ধুরা ঠিকই আছে, যদি না বন্ধুদের ক্ষতি চাও।

মেনে॥ তুমি আমার সহোদর। এই বুঝি তার পরিচয়।

আগা॥ ধর্মে তোমার সঙ্গে আছি, অধর্মে নয়।

মেনে॥ যদি তাই হয়, বন্ধুর মতো আমার দুঃখের ভাগ নাও।

আগা॥ যদি আমার মঙ্গল চাও, নিশ্চয়ই নেব, অন্যথা নয়।

মেনে॥ আর গ্রীস? গ্রীসের জন্য তুমি কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে চাও না?

আগা॥ গ্রীস? যে দেবতা আজ তোমাকে বুদ্ধিভ্রংশ করেছেন, সেই দেবতাই গ্রীসকেও বুদ্ধিভ্রষ্ট করেছেন।

মেনে॥ ধন্য তোমার বাহুবল। ভাই-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। আমি অন্য পথ দেখব, সন্ধান করব অন্য বন্দর—

[দূতের প্রবেশ]

দূত॥ সসাগরা গ্রীসের অধিপতি আগামেমনোন আমি তোমার প্রাসাদ থেকে তোমার কন্যা ইফিগেনেইয়াকে নিয়ে এসেছি। সঙ্গে এসেছেন তাঁর জননী, তোমার সহধর্মিনী ক্লুতাইম্‌নেস্ত্রা, আর তোমার শিশু পুত্র ওরেস্‌তেস। বহুদিন তুমি ঘর ছাড়া, তাঁদের দেখে তোমার আনন্দ হবে। তাঁরাও দীর্ঘপথ পরিভ্রমণ করে এসেছেন। এখন তাঁরা ঝর্ণার জলে তাঁদের পা ডুবিয়ে বসেছেন, ঘোড়াগুলিও বিশ্রাম করছে, আমরা তাদের প্রান্তরের ঘাসে চরে বেড়াবার জন্য মুক্ত করে দিয়েছি। আমি এসে আগে খবর দিলাম। তুমি তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও।

লোকমুখে দ্রুতবেগে তাঁদের খবর ছড়িয়ে পড়েছে। সৈন্যদলের মধ্যে খবর পৌঁচেছে। তারা সবাই তোমার কন্যাকে দেখতে যাচ্ছে, সকলেই তোমার কন্যাকে এক ঝলকের জন্য দেখতে চায়। সে তো স্বাভাবিক। তারা বলছে, "বোধহয় কোনো উৎসব হবে, কিংবা বিবাহের আয়োজন।" কেউ বলছে বোধহয় রাজা আগামেমনোন কন্যার অদর্শনে কাতর হয়ে পড়েছেন বলেই তাঁকে আনিয়েছেন। কেউ বলছে আউলিসের রাণী দেবী আর্তেমিসের কাছে ঐ কুমারী কন্যার বিবাহের অর্ঘ্য দেওয়া হবে। কে ঐ কন্যার স্বামী হবে, সবাই জিজ্ঞাসা করছে।

রাজা, তাহলে পরবর্তী কর্তব্য সম্পন্ন করো। উৎসর্গের ডালি সাজিয়ে আনো, চলো বেদীর দিকে, মাথায় জড়িয়ে নাও মালা। রাজা মেনেলাওস, তুমিও তৈরী হও, আয়োজন করো বিবাহ ভোজের, বাঁশী বেজে উঠুক শিবিরে শিবিরে, আরম্ভ হোক নৃত্য। আজ কুমারীর জীবনে এক শুভদিন।

আগা॥ সাধু! এখন ভেতরে যাও, বিশ্রাম করো। যা আমার কর্তব্য সবই ঠিক ঠিক করব।

[দূতের প্রস্থান]

হায়! আমার হতভাগ্য! কি উত্তর দেব? কোথা থেকে শুরু করব? ভাগ্যের জালে আমি বাঁধা। বড়ো চতুর কৌশল ফেঁদেছিলাম কিন্তু ভাগ্য আরও চতুর।

যারা সাধারণ মানুষ তারাই ভাগ্যবান। দুঃখের দিনে তারা কাঁদতে পারে, কাউকে মন খুলে বলতে পারে দুঃখের কথা। কিন্তু আমরা যারা সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, দুঃখের দিনেও মেনে চলতে হবে আভিজাত্যের নিয়ম। আমরা জনতার ক্রীতদাস। আমার চোখের জল ফেলতে লজ্জা করে, অথচ এই দুঃখের দিনে অশ্রু গোপন করতে পারে শুধু নির্লজ্জ। এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কি?

আমি—আমার স্ত্রীকে—আমি তাঁকে কি বলব? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কোন্ কথা বলব? কোন্ মুখে তাঁকে সম্ভাষণ করব? চারদিকে আমার বিপদ, বড়ো জটিলতা, এর মধ্যে তিনি কেন চলে এলেন? আমি তো চাইনি তিনি আসুন। কিন্তু কন্যার বিবাহে মা-র আসাটা তো স্বাভাবিক। আদরের দুলালীকে অন্যের হাতে তুলে দিতে জননী আসবে না? কিন্তু তিনি জানতে পারবেন আমার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা! হতভাগিনী ইফিগেনেইয়া, কুমারী কন্যা।

কুমারী? কেন আর কুমারী বলছি? তার তো এখনই বিবাহ হবে মৃত্যুর সঙ্গে। তার জন্য যে বুক ভেঙে যায়! আমি শুনতে পাচ্ছি সে আমাকে বলছে, বাবা, তুমি কি আমাকে হত্যা করবে? তোমার, তোমার প্রিয়জনদের বিবাহ কি এইভাবে হয়েছিল?

ওরেস্‌তেস-ও এসেছে এদের সঙ্গে। তার মুখে এখনও কথা ফোটেনি। সে আর্ত চীৎকার করবে, সেই অর্থহীন ধ্বনিতে সব কিছুর অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আঃ আঃ। প্রায়ামের পুত্র প্যারিস, হেলেনের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে আমার এ কি ভয়াবহ সর্বনাশ করে গেল! এ সবই তার জন্য। এই সর্বনাশের মূল সে।

কোরাস ॥ আমরাও আজ বেদনায়
অভিভূতা,
তোমার অপরিচিতা আমরা
তবু তোমার দুর্ভাগ্যে
আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছি দুঃখে।

মেনে ॥ ভাই, এসো আমার হাত ধরো।

আগা ॥ এই নাও আমার হাত, মেনেলাওস, তোমারই জয়, আমার হার।

মেনে ॥ পেলোপ্‌স-এর নামে শপথ করছি, পেলোপ্‌স, যাঁকে আমাদের পিতা, পিতা বলে সম্বোধন করতেন, তাঁর নামে, এবং আমাদের জন্মদাতা আত্রেয়ুসের নামে শপথ করে বলছি—আমি সব কথাই তোমাকে বলব, কোনো কিছুই গোপন করতে চাই না—যখন দেখলাম তোমার চোখে জল তখন তোমার জন্য আমারও চোখ জলে ভরে এল। আমি আগে যা বলেছি সব প্রত্যাহার করছি। আমি তোমার বিরুদ্ধে নই, আমি তোমার সঙ্গে। আমার কথা শোন। আমার জন্য তোমার কন্যাকে হত্যা কোর না। আমি সুখ পাব আর তুমি আর্তনাদ করবে যন্ত্রণায়, আমার চোখ ভরা থাকবে দিনের আলোয়, আর তোমার প্রাণের দুলালী যাবে মরণের অন্ধকারে। এ অন্যায় হতেই পারে না। আমি কি এই চেয়েছি? যদি বিবাহই আমার অভিলাষ হয়, তাহলে কি আমি কোনো যোগ্য নারী খুঁজে নিতে পারি না? শুধু হেলেনকে ফিরে পাবার জন্য আমি কি ভাইকে ঠেলে দেব সর্বনাশের মুখে? তার কল্যাণের বদলে চাইব অকল্যাণ?

আমি ভুল করেছিলাম, হঠকারী হয়েছিলাম। একবারও মনে হয়নি নিজের সন্তানকে হত্যা করা কি নৃশংস! আজ আমার বুক ভরে উঠেছে দুঃখে, আমারই মেয়ের মতো ঐ মেয়ে। আমার সুখের জন্য তাকে প্রাণ দিতে হবে? কি সম্পর্ক তার হেলেনের সঙ্গে? ভেঙে দাও সৈন্যদল, আউলিস ছেড়ে তারা চলে যাক নিজের দেশে। আর নয়, তোমার অশ্রু আমারও অশ্রু।

যাই হোক দৈববাণীর নির্দেশ, আমি তাতে আগ্রহী নই। এখন তোমার বিবেচনা মতো কাজ করো। জানি আমার ভয়াবহ ক্রোধ থেকে এই পরিবর্তন তোমার আকস্মিক মনে হচ্ছে। না, আকস্মিক নয়, এই স্বাভাবিক। এ দুর্বলের অস্থিরচিত্ততা নয়, এ হ'ল সহোদরের ভালোবাসা। আমি বেছে নিলাম যথার্থ পথ।

কোরাস ॥ মহৎ তোমার আচরণ
তোমার কথা জেউসপুত্র তান্‌তালোসের বংশধরের উপযুক্ত।
তোমার কথায় পূর্বপুরুষেরা তৃপ্ত হবেন।

আগা ॥ তোমাকে সাধুবাদ জানাই মেনেলাওস, সত্যিই এ আমার প্রত্যাশার বাইরে। যা বললে সবই সঙ্গত, সবই তোমার চরিত্রের উপযুক্ত। নারীর জন্য, অর্থের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ ঘনায়, জীবন ভরে যায় কটু তিক্ততায়। সেই বিরোধ আমি ঘৃণা করি। কিন্তু আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁচেছি যেখান থেকে আমার ফেরার পথ নেই। আমার কন্যার রক্তাক্ত মৃত্যু আমার হাতেই সম্পন্ন হবে।

মেনে ॥ কেন? কে তোমাকে বাধ্য করবে?

আগা ॥ গ্রীসের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী।

মেনে ॥ তুমি যদি ওদের এখনই আর্গোসে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

আগা ॥ তা হয়ত গোপনে করা সম্ভব, কিন্তু আরো ব্যাপার আছে—

মেনে ॥ অন্য আর কি? জনতার সঙ্গে আচরণে এত ভয় পেলে চলে না।

আগা ॥ কালখাস সৈন্যদের কাছে দৈববাণীর কথা জানিয়ে দেবে।

মেনে ॥ তার আগেই তো তার মৃত্যু সম্ভব, সেটা খুব কঠিন কাজ নয়।

আগা ॥ ঐ সব দৈবজ্ঞরা বড়ো বেশি উচ্চাভিলাষী।

মেনে ॥ জানি সব অপদার্থের দল ওরা।

আগা ॥ আরো একটা ব্যাপার ভয়ের, তোমার কি তাই মনে হয় না।

মেনে ॥ পরিষ্কার করে বলো, বুঝতে পারছি না।

আগা ॥ একজন সব কিছু জানে। সিসুফোসের পুত্র ওদুস্‌সেউস।

মেনে ॥ কিন্তু ওদুস্‌সেউসকে ভয় পাবার কিছু নেই।

আগা ॥ ওদুস্‌সেউস বড়ো ধূর্ত, যেদিকে দল ভারী ও সেদিকে।

মেনে ॥ সে আসলে উচ্চাশার ক্রীতদাস। উচ্চাশা বড়ো কঠিন ব্যাধি।

আগা॥ তুমি বুঝতে পারছ না, কল্পনা কর গ্রীক সৈন্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওডুসসেউস কালখাসের দৈববাণীর ব্যাখ্যা করছে, আমি যে আর্তেমিসের কাছে ইফিগেনেইয়াকে আহুতি দিতে সম্মত হয়েছিলাম সেকথা বলছে, আর বলছে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা, প্রতারণার কথা। বুঝতে পারছ না সে সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে তুলবে, হত্যা করাবে আমাকে, তোমাকে, তারপর আহুতি দেবে আমার কন্যাকে। যদি আমি আর্গোসে পালিয়ে যাই, ওরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করবে, ধূলোয় মিশিয়ে দেবে আমাদের প্রাচীর, আমাদের নগরী।

এই আমার অবস্থা। হতভাগ্য আমি, নিরুপায় আমি। কী কঠিন শাস্তি দেবতাদের। এখন আমার কিছুই করার নেই। মেনেলাওস, আমার একটি অনুরোধ, শিবিরে ফিরে যাও, যতক্ষণ না আমি ইফিগেনেইয়াকে আহুতি দিই ততক্ষণ যেন ক্লুতাইমনেস্ত্রা কিছু জানতে না পারেন। যতটা সম্ভব অবিচলিত থেকে আমাকে এই দুঃখ সহ্য করতে দাও।

তোমরা, আমার অপরিচিতা, তোমাদেরও বলছি, তোমরা নীরব থেকো।

[মেনেলাওস চলে যায়. আগামেমনোন যায় শিবিরের ভেতরে। কোরাসের নারীদল আগামেমনোনের অনুরোধে সম্মতি জানায়।]

কোরাস॥ তারাই সুখী
যাদের জীবনে ভালোবাসা সংযত
যাদের জীবনে আফ্রোদিতের তরঙ্গভঙ্গ ক্ষীণ ও শান্ত
তার উত্তাল কামনা যাদের উন্মত্ত করে না
তারাই পায় শান্তি
যেখানেই কামনা
সেখানেই কামদেবতা ত্রারাস তাঁর ধনুক থেকে
ছোঁড়েন দুটি মায়াবী তীর
একটি তীর আনে সুখ
অন্যটি বিপর্যয়।

হে অনিন্দ্যকান্তি আফ্রোদিতে
আমার প্রার্থনা
ঐ দ্বিতীয় তীরে আমার সংসার বিদ্ধ কোর না
প্রেম আমার জীবনে দিক সংযত কান্তি
আমার বাসনা হোক পবিত্র
আমার জীবনে তুমি এসো, আফ্রোদিতে
শান্ত পায়ে
রুদ্র প্রচণ্ড মূর্তিতে নয়।
মানুষের স্বভাব বিচিত্র, বিচিত্র তার কর্ম
কিন্তু সবচেয়ে সত্য ধর্ম
শিক্ষা মানুষকে নিয়ে যায় ধর্মে
বিনয় হল যথার্থ জ্ঞান,
জ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শ্রী,
শ্রী চিনিয়ে দেয় সত্যকে
যেখানে বিনয় সেইখানে জীবনের সুখ
জীবন সেখানে পূর্ণ, অম্লান মহিমায়,
ধর্মের অনুসরণ এক মহাব্রত
নারীর জীবনে সে আসে তার প্রেমের বোধে
পুরুষের জীবনে আসে নানা বিচিত্ররূপে
দেশকে ভরে দেয় সে বিপুল গৌরবে।

হায়, প্যারিস, তুমি একদিন ইদাপাহাড়ে এসেছিলে
তুমি ছিলে ধবল গাভীশিশুদের পালক
তুমি পালিত হয়েছিলে এখানেই
এক ভিন্‌দেশী সুর তুলেছিলে তোমার বাঁশীতে
তোমার বাঁশীতে উঠেছিল অলুমপুসের বাঁশীর প্রতিধ্বনি।
একদিন যখন তোমার লোভন গাভীর দল
বিচরণ করছিল প্রান্তরে প্রান্তরে অলসগতিতে
দেবীরা এসেছিলেন তোমার কাছে
বিচার করতে হবে তোমাকে
কে সব চেয়ে সুন্দর।

এক উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল তোমার বুকে
সেই উন্মত্ততাই তোমাকে টেনে এনেছিল গ্রীসে।
হাতীর দাঁতের মতো সাদা রাজপ্রাসাদের মধ্যে
তুমি দাঁড়িয়েছিলে
তোমার সঙ্গে হেলেনের হ'ল দৃষ্টি বিনিময়
তার চোখে তুমি নিক্ষেপ করলে প্রেমের বান
আর তার থেকে জন্ম নিল এক বিরোধ
তারই জন্য আজ সমস্ত গ্রীস তার সৈন্য, তার রণতরী নিয়ে
যাত্রা করেছে ট্রয় ধ্বংসের তীব্র আশায়।

[রথে চেপে ক্লুতাইম্নেস্ত্রা, ইফিগেনেইয়া ও
ওরেস্তেসের প্রবেশ। সঙ্গে অনুচরবৃন্দ।]

অনুচর ॥ মহতের সৌভাগ্যও মহৎ।
রাজকুমারী ইফিগেনেইয়া আমাদের
তুনদারেয়োসের দুহিতা ক্লুতাইম্নেস্ত্রা
এঁদের জন্ম মহাবংশে, মহাভাগ্যশালিনী এঁরা।
সম্পদে, শৌর্যে যাঁরা অসামান্য
সাধারণ মানুষের চোখে তাঁরাই তো দেবতা।

কোরাস ॥ নারীদের খালকিসের মেয়েরা সব, এসো
আমরা এখানে সার দিয়ে দাঁড়াই
রাণী নামবেন রথ থেকে
এসো তাঁকে আমরা স্বাগত জানাই
হাত বাড়িয়ে দিই,
তিনি আমাদের কোমল হাত ধরে
নেমে আসুন দৃঢ় চরণে।
আগামেমনোনের অসামান্যা কন্যা ইফিগেনেইয়া
আউলিসের মাটিতে নির্বিঘ্নে হোক
তাঁর প্রথমে পদক্ষেপ।
আমরা এদেশে নতুন, অপরিচিত
আর্গোসের নারীরাও,

এই দেশে আমাদের জন্য
তাঁদের কোনো কষ্ট না হয় দেখো।

ক্লুতা ॥ তোমাদের সম্ভাষণ শুভচিহ্ন। আমি এই কুমারী কন্যাকে
এনেছি বিবাহউৎসবে। আনন্দময় হোক এই উৎসব।
(অনুচরদের প্রতি) রথ থেকে উপহারগুলি নামাও, নামিয়ে
আনো বিবাহের উপঢৌকন, সাবধানে নিয়ে যাও শিবিরের
ভেতরে। এবার এসো, রথ থেকে নামো, আস্তে পা ফেলো
মাটিতে। এই যে মেয়েরা তোমরা একটু হাত বাড়াও,
একে ধরো। আমাকেও সহজে রথ থেকে নামতে পারি।
একজন কেউ এসে ঠিক ঘোড়ার কাঁধের কাঠের সামনে
দাঁড়াও, একটু খেয়াল না রাখলে, ওরা ভয় পেয়ে যাবে। এই
হল শিশু ওরেসতেস, একে ধরো। বাছা, এখনও ঘুমোচ্ছিস ?
রথের দোলায় ঘুম এসে গেছে। ঘুম থেকে যখন উঠবি,
দেখবি তোর দিদির বিয়ে। বর এক বিরাট বীর, সাগরের
অপ্সরা নেরেইদের বংশে তার জন্ম।
এইখানে এসো, ইফিগেনেইয়া, আমার পাশে। এইসব
মেয়েরা আমাদের দেখুক। আজ সত্যি আমি বড়ো খুশী।
ঐ যে তোমার পিতা আসছেন, যাও তাঁর সঙ্গে কথা বলো।

[আগামেমনোনের প্রবেশ]

ইফি ॥ আমি বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। মা, চলে যাচ্ছি বলে
যেন রাগ কোর না।

ক্লুতা ॥ আমি তো জানি তুমি বাবাকে কতো ভালোবাসো।
আগামেমনোন, রাজা। আমার জীবনে তোমার চেয়ে বড়ো
কেউ নয়। তোমার আদেশে আমরা এখানে এসেছি।

ইফি ॥ বাবা, কতদিন তোমায় দেখিনি, কতদিন। বাবা, তোমাকে
দেখে কী ভালো লাগছে।

আগা ॥ তোমার কথা আমারই মনের কথা। তোমাকে দেখেও আমার
মন ভরে উঠেছে।

ইফি ॥ তুমি ভালো আছ ? আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ বলে খুব খুশী
হয়েছি।

আগা ॥ আমি, বোধহয়, ভালোই। ঠিক, ঠিক।

ইফি ॥ মুখে বলছ, খুশী হয়েছ, ঠিক আছ, কিন্তু কেমন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে তোমায়।

আগা ॥ ওঃ রাজা আর সেনাপতির যে কত দুশ্চিন্তা।

ইফি ॥ সব ভুলে যাও এখন। বাবা এখন তুমি শুধু আমার সঙ্গে থাকবে।

আগা ॥ তোর সঙ্গেই তো আছি। আমার মন অন্য কোথাও নেই।

ইফি ॥ ঐতো তোমার কপালে ভ্রূকুটি, সব চিন্তা ভুলে যাও। শুধু আমার সঙ্গে কথা বলো।

আগা ॥ তাইতো বলছি, তোকে দেখে আমার আজ খুব আনন্দ।

ইফি ॥ অথচ তোমার চোখে জল—

আগা ॥ কতদিন পরে দেখা, তাই।

ইফি ॥ না, বাবা, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। কিছু বুঝতে পারছি না।

আগা ॥ তুই বুঝলে যে আমার আরো কষ্টরে।

ইফি ॥ তাহলে আমি কিছুই বুঝতে চাই না। তুমি যাতে খুশী হও তাই করব।

আগা ॥ সেই ভালো, আমার লক্ষী মেয়ে। (স্বগত) হায়, আজ সংযত হয়ে কথা বলারও শক্তি নেই আমার।

ইফি ॥ বাবা, তুমি আর কোথাও যেওনা, আমাদের সঙ্গে থাকো।

আগা ॥ তাইতো চাই, কিন্তু যা চাই তা পাই না, তাইতো এত দুঃখ।

ইফি ॥ এই সব যুদ্ধ শেষ হোক, শেষ হোক মেনেলাওসের সব তিক্ততা।

আগা ॥ তার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে, হয়ত আমিও।

ইফি ॥ বাবা, তোমরা কতদিন আউলিসে আটকে আছ?

আগা ॥ একটা অসুবিধে হয়েছে, তাই সৈন্যরা এগোতে পারছে না।

ইফি ॥ বাবা, ট্রয় কতদূরে? কতদূরে থাকে ট্রয়ের লোকেরা?

আগা ॥ অনেকদূর, যেখানে থাকে প্রায়ামের ছেলে প্যারিস। (স্বগত), প্যারিস, কেন যে সে জন্মেছিল!

ইফি ॥ বাবা, তুমি আমাকে ফেলে অনেক দূরে চলে যাবে।

আগা ॥ তুইও তো আমাকে ফেলে অনেক দূরে চলে যাবি।

ইফি ॥ যদি আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারতাম।

আগ ॥ তুই যাবি এক দীর্ঘ পথে, তখন কি আর আমাকে মনে থাকবে?

ইফি ॥ আমাকে কি একা যেতে হবে? মা থাকবে না আমার সঙ্গে?

আগা ॥ মা নয়, বাবা নয়, একেবারেই একা একা।

ইফি ॥ তার মানে তুমি কি আমাকে অন্য কোথাও রাখার ব্যবস্থা করছ?

আগা ॥ অনেক বলেছি, আর নয়। ছোটো মেয়েদের অত জানতে নেই।

ইফি ॥ ট্রয়ে তোমার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

আগা ॥ তার আগে এখানে আউলিসে আমাকে একটি উৎসর্গের ব্যবস্থা করতে হবে।

ইফি ॥ উৎসর্গ তো ধর্মের অঙ্গ। তা তো করতেই হবে।

আগা ॥ সেই উৎসর্গ তুমি দেখবে। পবিত্র জলে-ধোওয়া বেদীর ধারে তুমি দাঁড়াবে।

ইফি ॥ বেদীর চারদিকে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা নাচব?

আগা ॥ (স্বগত) অজ্ঞানতা কী সুখের? সত্যি ঈর্ষা হয় তোকে। (প্রকাশ্যে) তুমি এখন ভেতরে যাও। শিবিরের বাইরে বেশীক্ষণ থেকো না।

আমাকে একবার চুমো খা। তোর হাত বাড়া। বাপের কাছ থেকে অনেক দূরে তোকে চলে যেতে হবে। (মেয়েকে জড়িয়ে ধরে) আঃ এই মুখ, এই সোনালি চুল। ট্রয় আর হেলেন তোর ওপরে কী কঠিন পাষাণ ভার চাপিয়ে দিয়েছে। না, আর নয়, আর নয়। তোকে স্পর্শ করলেই আমার চোখ জলে ভরে আসে।

[ইফিগেনেইয়া ভেতরে যায়]

ক্লুতাইমনেস্ত্রা, লেদা-দুহিতা, রানী

আখিল্লেসের সঙ্গে ইফিগেনেইয়ার বিবাহ, তাই বড়ো বেশি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। ক্ষমা কোরো।

এ বিদায় সুখেরই হবার কথা। কিন্তু পিতার হৃদয়। এই বিচ্ছেদ বড়ো তীব্র। এতদিন যাকে লালন করেছি তাকে বিদায় দিতে হবে, তাই এত কষ্ট, এত বেদনা।

ক্লুতা ॥ একই বেদনায় আমিও বিহ্বল। তোমাকে কোন্ মুখে

আমি বলব। যখন কুমারীর দল বিবাহ-সংগীত গাইবে, আর আমাকে চলতে হবে সকলের আগে, তখন আমিও সংযত থাকতে পারব না, তোমারই মতো বিবশ হয়ে পড়ব।

তবে বিবাহ একটা নিয়ম। নিয়মকে তো মানতেই হবে। সময় সব কষ্টই ভুলিয়ে দেবে।

আমাদের এই সৌভাগ্যবান জামাতার নাম শুনলাম। কোথায়, কোন্ বংশে তার জন্ম?

আগা॥ আসাপোদের এক কন্যার নাম হল আইজিনা—

কুতা॥ কার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল? কোনো দেবতা না মানুষের সঙ্গে?

আগা॥ স্বয়ং জেউসের সঙ্গে। তাঁদের সন্তান হল আইকোস, ওইনোলে দ্বীপের অধীশ্বর।

কুতা॥ তারপর কোন্ সন্তানটি সেই দ্বীপের রাজা হলেন?

আগা॥ পেলেউস। তিনি বিবাহ করলেন সাগর দেবতা নেরেউসের এক মেয়েকে।

কুতা॥ দেবতা কি সেই বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন? না—

আগা॥ জেউসই সম্বন্ধ করেছিলেন, বিবাহ দিয়েছিলেন—

কুতা॥ কোথায় তাঁদের বিবাহ হল? সমুদ্রের গভীর—

আগা॥ না, পবিত্র পেলিয়োন পাহাড়ের পাদমূলে, যেখানে মহাজ্ঞানী খেইরোন থাকেন—

কুতা॥ সেই যেখানে লোকে বলে কেনতাউরয়া থাকে?

আগা॥ সেখানেই, দেবতারা সবাই পেলেউসের বিবাহ-বাসরে যোগ দিয়েছিলেন।

কুতা॥ কে মানুষ করলেন আখিল্লেসকে? পিতা, না জননী থেতিস?

আগা॥ সংসারের সব মন্দ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাকে রাখা হয়েছিল খেইরোনের কাছে।

কুতা॥ খেইরোন অতি বিচক্ষণ, যিনি খেইরোনের কাছে তাঁর সন্তানকে পাঠিয়েছিলেন তিনি আরো বিচক্ষণ।

আগা॥ এই হল তোমার কন্যার বরের পরিচয়।

কুতা॥ না, কোনো খুঁত দেখছি না। স্কীরসে কোথায় থাকে, কোন নগরীতে?

আগা॥ আপিদানোস নদীর ধারে ফ্থিয়া নগরে।

কুতা॥ সেখানেই কি সে আমাদের মেয়েকে নিয়ে যাবে?

আগা॥ সেটা সে ঠিক করবে।

কুতা॥ আমি এদের আশীর্বাদ করি। শুভ হোক এ বিবাহ। কবে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে?

আগা॥ আগামী পূর্ণিমা। শুভলগ্ন।

কুতা॥ তুমি কি দেবতাদের উদ্দেশে কোনো উৎসর্গের আয়োজন করেছ?

আগা॥ হ্যাঁ করছি, সেই নিয়েই আমি চিন্তিত।

কুতা॥ তারপর তো বিবাহের ভোজ?

আগা॥ হ্যাঁ। দেবতারা যা চান তা উৎসর্গ হয়ে গেলে— তারপর।

কুতা॥ মেয়েদের যেসব স্ত্রী-আচার হবে তার ব্যবস্থা কোথায় হবে?

আগা॥ তা— এখানেই। আর্গোসের নৌকার সারির কাছেই হবে।

কুতা॥ এখানে? বেশ, তাই বোধহয় ভালো।

আগা॥ কি কি করতে হবে জানো তো? আমার কথা মতোই সব কাজ কোরো।

কুতা॥ সে তো চিরকালই করেছি। কি করতে হবে, বলো।

আগা॥ যখন বর এখানে আসবে তখন আমি—

কুতা॥ তুমি? এ তো মায়ের কাজ, আমার কাজ। তুমি কি করবে?

আগা॥ আমি গ্রীক সৈন্যদের সামনে এই বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। আমি—

কুতা॥ আমি তাহলে কোথায় থাকব?

আগা॥ তুমি আর্গোসে ফিরে যাবে। অন্য মেয়েদের কাছে থাকবে।

কুতা॥ এখানে ইফিগেনেইয়াকে ফেলে রেখে? কে তাহলে বধূর জন্য মশাল জ্বালবে? মা-কেই যে বিবাহ উৎসবের আলো জ্বালতে হয়।

আগা॥ না, না, সে আলোর ব্যবস্থা আমি করব।

কুতা॥ সে কি? তা তো নিয়ম নয়। এসব নিয়ম তো তুচ্ছ করার নয়।

আগা॥ কিন্তু এই সৈন্যদের মধ্যে তোমার থাকা সংগত হবে না।

কুতা॥ কন্যার বিবাহে তার মায়ের উপস্থিতি খুবই সংগত।

আগা॥ আমাদের অন্য মেয়েদের একা ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

কুতা॥ তারা অন্তঃপুরে নিরাপদেই আছে।

আগা॥ শোনো, আমি যা বলছি করো।

ক্লুতা॥ তা কি করে হয়! আর্গোসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দোহাই, তুমি যাও, বাইরের কাজকর্ম তোমার, ঘরের ভেতরের অনুষ্ঠান আমার।

[ক্রুদ্ধা ক্লুতাইমনেস্ত্রার প্রস্থান]

আগা॥ বৃথা চেষ্টা। ক্লুতাইমনেস্ত্রাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার সব পরিকল্পনাই নিষ্ফল। আমি ফন্দী আঁটছি, যারা প্রিয়জন তাদেরই প্রতারণার চেষ্টা করছি। আমি বিভ্রান্ত, আমি ব্যর্থ।
এখন যাই পুরোহিত কালখাসের কাছে। তার কাজ আহুতির আয়োজন, তাতে দেবতার তৃপ্তি, আর আমার সর্বনাশ। গ্রীসের কাছে আমার অনেক ঋণ, সেই ঋণভার আমাকে বইতেই হবে। সৎ লোকে চায় কল্যাণী সহধর্মিণীর সহায়তা, নইলে সহধর্মিণীর প্রয়োজন কি?

[আগামেমনোনের প্রস্থান]

কোরাস॥ এবার গ্রীক সৈন্যের দল
যাত্রা করবে পাল উড়িয়ে
অসংখ্য রণতরী, অগণ্য অস্ত্র নিয়ে,
রূপালি তরঙ্গভরা সিমোইস নদীর তীরে
ট্রয়ের প্রাচীরের বাইরে
ইলিয়নের উন্মুক্ত প্রান্তরে
তারা পৌঁছবে।

আপোল্লোর স্নেহধন্য ট্রয়
আমরা শুনেছি সেখানে রাজকুমারী কামান্দ্রা
এলিয়ে দেন তাঁর সবুজ পাতার মালায় ঢাকা
সোনালি চুলের রাশ
দেবতা ভর করেন তাঁর দেহে
আর তিনি দেখতে পান অনাগত ভবিষ্যতের ছবি

ট্রয়ের দুর্গের চারপাশে ঘেরা প্রাচীরে
দাঁড়াবে ট্রয়ের সৈন্য
রণদেবতা আরেস তাঁর ধর্ম নিয়ে

সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ভেঙে দাঁড় বেয়ে
ক্রমশই এগিয়ে যাবেন
সিমোইসের মোহানায়,
তিনি ফিরে পেতে চান
জেউসের যমজ সন্তান, আকাশবাসী দিওসকোরোইদের বোন
হেলেনকে,
বর্শা আর বর্ম আর রণক্ষেত্রের স্বেদ রক্ত ক্লান্তির বিনিময়ে
প্রায়ামের রাজ্য থেকে
তাকে আবার ফিরতে হবে গ্রীসে
অসংখ্য নারীর বিলাপ শোনা যাবে
জেউস দুহিতা হেলেন অশ্রুভরা চোখে
ভাববে তার ফেলে আসা স্বামীর কথা

ও, এই সর্বনাশা দুঃখ যেন কোনদিন না আসে
আমাদের জীবনে
আমাদের সন্তানদের জীবনে।
সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিনে
লুসিয়ার ধনী মহিলারা
ট্রয়ের হতভাগ্য বধূরা
হাহাকার করবে,
তারা শিউরে উঠে ভাববে
যেমন করে ফুল ছিঁড়ে নেয় গাছ থেকে
কে তাদের এখনই চুল ধরে
আগুনজ্বলা ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাবে
গ্রীক শিবিরে।

এ সবই তোমার জন্য, হেলেন।
শুনেছি জেউস একদিন
দীর্ঘ গ্রীবা রাজহাঁসের রূপ ধরেছিলেন লেদার জন্য
তুমি তাঁদেরই সন্তান।

জানি না এ কথা সত্য কিনা
হয়তো এ কাহিনী, হয়তো কল্পনা।
তবু তোমারই জন্য, নারী
এই প্রলয়, এই সর্বনাশ।

[আখিল্লেসের প্রবেশ]

আখি॥ কোথায় গ্রীক সৈন্যের সর্বাধিনায়ক? কেউ তাঁকে খবর দিতে পারবে, আমি পেলেউসের সন্তান আখিল্লেস তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছি।

আমরা আজ এউরিপোস সমুদ্রের ধারে বহুদিন ধরে বসে আছি। নানারকম লোক আমাদের মধ্যে। কেউ কেউ তাদের পুত্রকন্যা পরিবার ফেলে এসেছে দেশে। কেউ কেউ তাদের পিতামাতা। এক প্রচণ্ড যুদ্ধের মাদক ইচ্ছায় সমস্ত গ্রীস আজ আক্রান্ত। এ এক অলৌকিক উন্মাদনা।

আমি এসেছি ফার্সালিয়া থেকে, সেখানে আমার পিতা পেলেউস রয়েছেন। এখানে এউরিপোস সমুদ্রের তীরে বাতাসের প্রতীক্ষায় বসে আছি। আমার মুরমিদোন সৈন্যদল অশান্ত হয়ে উঠছে। দিনের পর দিন তারা আমাকে বলছে, আখিল্লেস, কেন আমরা শুধু শুধু অলসভাবে দিন কাটাচ্ছি? ট্রয় অভিযানের জন্য আরো কত কাল বসে থাকতে হবে? যদি যেতে হয় চলো, নইলে আমরা ফিরে যাই। আত্রেউস পুত্রদের দীর্ঘসূত্রতা আর সহ্য হয় না।

[ক্লুতাইমনেস্ত্রার প্রবেশ]

ক্লুতা॥ আখিল্লেস, দেবী নেরেইদের পুত্র! তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলাম। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছি।

আখি॥ এ কি লজ্জার কথা!
কে এই লাবণ্যময়ী নারী!

ক্লুতা॥ আমাকে না চেনাই স্বাভাবিক। তুমি আমাকে আগে কখনও দেখনি। নারীর প্রতি তোমার সম্ভ্রম দেখে খুশী হলাম।

আখি॥ কে তুমি? কেন এই গ্রীক শিবিরে? চারিদিকে সৈন্যের দল, তুমি এখানে একা—

ক্লুতা॥ আমি লেদার দুহিতা, ক্লুতাইমনেস্ত্রা। আমার স্বামী আগামেমনোন।

আখি॥ সংক্ষিপ্ত সুন্দর পরিচয়।
কিন্তু কোনো নারীর সঙ্গে এখানে আমার কথা বলা বোধহয় অশোভন।

ক্লুতা॥ দাঁড়াও, চলে যাচ্ছ কেন?
এই আমার হাত, আমার হাতে তোমার হাত রাখো। বিবাহ-উৎসবের শুভারম্ভ হোক।

আখি॥ কি বলছ তুমি? তোমার হাত স্পর্শ করব? আমি এই অনুচিত কাজ করতে পারি? আগামেমনোনের কাছে কি উত্তর দেব?

ক্লুতা॥ অনুচিত? আখিল্লেস তুমি সমুদ্রের অধিপতি নেরেইদের পুত্র, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করবে, তুমি—

আখি॥ বিবাহ? তোমার কন্যাকে? তোমার কথায় আমি নির্বাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি তো?

ক্লুতা॥ বিবাহের কথায় পুরুষেরা লজ্জা পায়, নতুন আত্মীয়াদের সঙ্গে পরিচয়ের সংকোচ খুবই স্বাভাবিক। আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারছি।

আখি॥ কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো কোনোদিন তোমার কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিইনি, আগামেমনোনও কোনোদিন এ বিষয়ে কোনো কথা বলেননি আমাকে।

ক্লুতা॥ সে কি?
তাই তুমি আমার কথায় অমন অবাক হচ্ছ। আমি তোমার কথায় বিমূঢ় বোধ করছি।

আখি॥ কিন্তু এর একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। আমরা দুজনেই ভুল করতে পারি না।

ক্লুতা॥ তাহলে কি প্রতারণা? আমি কি প্রতারিত? তাহলে এ বিবাহ কি মিথ্যা! ছি ছি! কী লজ্জা!

আখি॥ নিশ্চয়ই, কেউ তোমার সঙ্গে, আমাদের দুজনেরই সঙ্গে কৌতুক করেছে। ভুলে যাও। সহজভাবেই নেবার চেষ্টা করো।

ক্লুতা॥ আর তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আমি যাই। আমি মিথ্যাবাদিনী প্রতিপন্ন হলাম। কী অপমান।

আখি॥ আমি তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। বিদায়।

[দুজনেই চলে যাবার মুখে, তখন নেপথ্য থেকে বৃদ্ধ ক্রীতদাসের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

বৃদ্ধ॥ (নেপথ্যে) একটু দাঁড়াও, দেবীপুত্র আখিল্লেস। লেদা-কন্যা ক্লুতাইমনেস্ত্রা।

আখি॥ কার কণ্ঠস্বর? কে ডাকছে? তার কণ্ঠস্বর যেন আবেগে থরথর করছে।

বৃদ্ধ॥ (নেপথ্যে) আমি এক ক্রীতদাস। না, তার জন্য আমি কুণ্ঠিত নই, এ আমার ভাগ্য।

আখি॥ ক্রীতদাস? কার? আমার নিশ্চয়ই নয়। এখানে তো সবই আগামেমনোনের সম্পত্তি।

বৃদ্ধ॥ (নেপথ্যে) আমি ঐ মহিলার ক্রীতদাস। ঐ যিনি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পিতা তুনদারেওস আমাকে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন।

আখি॥ কি বলতে চাও তুমি। বলো, কি চাও?

বৃদ্ধ॥ (নেপথ্যে) ওখানে তোমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই তো?

আখি॥ শুধু আমরাই। বাইরে এসো।

[বৃদ্ধ ক্রীতদাসের প্রবেশ]

বৃদ্ধ॥ হায়, হায়! আমার অদৃষ্ট! ঈশ্বর এই আমার ভাগ্য। যাদের আমি ভালোবাসি, জেউস, তুমি তাদের বাঁচাও।

আখি॥ বক্তৃতা পরে দিও। আসল কথা বলো।

ক্লুতা॥ ভয় পেও না। হাত ধরো। বলো কি হয়েছে।

বৃদ্ধ॥ তুমি তো আমাকে জানো। জানো আমি তোমাকে আর তোমার সন্তানদের কত ভালোবাসি।

ক্লুতা॥ তুমি আমাদের অনেককালের ভৃত্য।

বৃদ্ধ॥ রাজা আগামেমনোনের সঙ্গে তোমার বিয়ের যৌতুক।

ক্লুতা॥ তুমি আমার সঙ্গে আর্গোসে এসেছিলে, আর সেই থেকে আছ।

বৃদ্ধ॥ আমি চিরকালই তোমার ভালো চেয়েছি, তোমার স্বামীর স্বার্থের চেয়েও তোমার ভালোর কথা ভেবেছি।

ক্লুতা॥ জানি। এবার তোমার কথাটা খুলে বলো দেখি।

বৃদ্ধ॥ তোমার মেয়ে— তাকে তার পিতা নিজের হাতে হত্যা করতে মনস্থ করেছেন—

ক্লুতা॥ কি? কি বললে? তোমার মাথা ঠিক আছে? খুলে বলো, বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ॥ তার পিতা তার ঐ শ্বেতশুভ্র গলায় খড়্গের আঘাত করবেন।

ক্লুতা॥ কি ভয়াবহ কথা! তিনি কি উন্মাদ হয়ে গেছেন।

বৃদ্ধ॥ তিনি সব ব্যাপারেই স্থির, প্রাজ্ঞ। কিন্তু তোমাদের, তুমি আর ইফিগেনেইয়ার ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

ক্লুতা॥ কেন? কেন? কোন্ পিশাচ তাঁকে এই মতি দিয়েছে?

বৃদ্ধ॥ দৈববাণী। কালখাসের মতে, সৈন্যদের যদি সমুদ্রযাত্রা করতে হয় তাহলে—

ক্লুতা॥ কী ভয়াবহ! পিতা হত্যা করবে নিজের সন্তান!

বৃদ্ধ॥ সৈন্যরা যাবে দারদানুসের দেশে, ট্রয়ে, মেনেলাওসের হেলেনকে উদ্ধার করতে— তাই—

ক্লুতা॥ হেলেনের পুনরাগমন মানে ইফিগেনেইয়ার মৃত্যু?

বৃদ্ধ॥ সবই বললাম। আর্তেমিসের কাছে আগামেমনোন তাঁর কন্যাকে আহুতি দেওয়া স্থির করেছেন।

ক্লুতা॥ তাহলে, বিবাহ, বিবাহের কথা একটা ছল। এই বিবাহের কথাতেই তো আমি এখানে এসেছি।

বৃদ্ধ॥ জানি আখিল্লেসের বধূরূপে ইফিগেনেইয়াকে দেখার অনেক আশা, অনেক আনন্দ নিয়েই এসেছ।

ক্লুতা॥ হায়! হতভাগিনী! এখানে আসলে তুই এসেছিস মৃত্যুর কাছে। তোর আর তোর এই হতভাগিনী মা— দুজনেরই মৃত্যু।

বৃদ্ধ॥ তোমাদের অদৃষ্ট করুণাহীন, আগামেমনোনের সিদ্ধান্ত পৈশাচিক।

ক্লুতা॥ সব যে ভেঙে চুমার হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল। সব যে ভেসে যায় চোখের জলে।

বৃদ্ধ ॥ সন্তান-হারানোর শোক— কাঁদো, তুমি কাঁদো।

ক্লুতা ॥ কিন্তু তুমি এসব জানলে কি করে, বৃদ্ধ? কোথায় এসব জানলে?

বৃদ্ধ ॥ তোমাকে প্রথম যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাঁর আগের নির্দেশ বদ্‌লে আবার একটি চিঠি লিখেছিলেন আগামেমনোন, আমারই হাতে সেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

ক্লুতা ॥ সে চিঠিতে কি আমাদের এখানে আসার নির্দেশ ছিল, না, আসতে নিষেধ করা হয়েছিল।

বৃদ্ধ ॥ নিষেধই করা হয়েছিল। সে মুহূর্তে তোমার স্বামী ছিলেন প্রকৃতিস্থ।

ক্লুতা ॥ তাহলে সে চিঠি নিয়ে তুমি আমার কাছে আসোনি কেন?

বৃদ্ধ ॥ মেনেলাওস সে চিঠি আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিল। সমস্ত বিপদের মূল ঐ মেনেলাওস।

ক্লুতা ॥ জেরেইদের পুত্র, পেলেউসের সন্তান। সব শুনলে।

আখি ॥ শুনলাম। তোমার দুঃখ অনুভব করতে পারি। আমাকে যেভাবে এর মধ্যে জড়ানো হয়েছে তা আমি সহজে মেনে নিতে পারছি না।

ক্লুতা ॥ ওরা আমার মেয়েকে খুন করতে চায়। তোমার সঙ্গে বিবাহের ফাঁদ পেতে ওকে ওরা ধরে এনেছে।

আখি ॥ শুধু সেজন্যই নয়, আরো নানা কারণে আমি আগামেমনোনকে অপরাধী মনে করি।

[হঠাৎ ক্লুতাইমনেস্ত্রা নতজানু হয়ে বসে আখিল্লেসের দুই জানু জাপটে ধরলেন]

ক্লুতা ॥ তোমার জানু ধরে প্রার্থনা করতে কোনো লজ্জা নেই আমার। আমি সাধারণ মানবী। তুমি দেবতার পুত্র। আজ তোমার কাছে আমার কিসের অহংকার! আমার কাছে আজ সবচেয়ে বড়ো হল আমার কন্যার জীবন। তুমি দেবতার পুত্র, তুমি আমাকে বাঁচাও এই দুঃখ থেকে, রক্ষা করো ইফিগেনেইয়াকে। সে তোমার বধূ, যদিও সবই মিথ্যা ছলনা, তবু তাকে তুমি রক্ষা করো। তোমারই জন্য তাকে আমি ফুলসাজে সাজিয়েছি,

তোমারই জন্য তাকে এনেছিলাম বধূ-বেশে, কিন্তু এখন দেখছি সে এসেছে ঘাতকের কাছে। তুমি যদি তাকে রক্ষা না করো, অপযশ হবে তোমার। ঠিকই, তোমার সঙ্গে তার বিবাহ হয়নি, তবু লোকে এই হতভাগ্য কুমারীর স্বামী বলে জেনেছে তোমাকেই। তোমার চিবুক স্পর্শ করছি, তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরে বলছি, তোমার মায়ের কথা স্মরণ করে বলছি, আখিল্লেস তোমার খ্যাতিই বিপর্যয় এনেছে আমার জীবনে, তোমার খ্যাতিই এখন আমাকে রক্ষা করুক।

তোমার চরণমূল ছাড়া আজ আর কোন্ পূজাবেদীতে আশ্রয় নেব? আজ আমার কোনো বন্ধুর মুখে নেই সহাস্য অভ্যর্থনা। তুমি শুনলে আগামেমনোনের চক্রান্তের কথা, কী নিষ্ঠুর, কী নির্মমতা; তার নীতি নেই, ধর্ম নেই। এখানে আমি একাকিনী, নাবিকদের শিবিরে সহায়হীনা, একা। ওরা যুদ্ধের দিনে যতই উপযোগী হোক, ওরা উচ্ছৃঙ্খল, যে-কোনো দুষ্কর্মে সমর্থ। তুমি যদি আমার দিকে হাত বাড়াও, আমি আশ্রয় পাব, তা নাহলে আমার মৃত্যু অনিবার্য।

কোরাস ॥ মাতৃত্ব এক গভীর বিস্ময়
নারীর অন্তরে জেগে আছে এক রহস্যময়ী শক্তি
সন্তানের জন্য সব দুঃখ বহন করে জননী।

আখি ॥ তোমার কথায় অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছি আমি। আমি শিক্ষা পেয়েছি বিজয়ের আনন্দে অনুচ্ছ্বসিত থাকতে, আর বিপদের দিনে অনুদ্বেলিত হতে। যারা তা পারে তারা প্রাজ্ঞ, তারাই জীবনের পথে নির্বিঘ্নে হাঁটতে পারে। কিন্তু জীবনে মাঝে মাঝে এমন মুহূর্ত আসে যখন এই প্রাজ্ঞতা অর্থহীন, জীবনে তখন প্রয়োজন সাধারণ বুদ্ধি, স্বাভাবিক বোধ। আমি পালিত হয়েছিলাম খেইরোনের গৃহে, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম ঋজুতা ও স্পষ্টতার অভ্যাস। আত্রেউসের সন্তানদের নির্দেশ যদি সংগত হয় আমি অবশ্যই তা পালন করব, কিন্তু অসংগত হলে পালন করব না। আমার সাধ্যমতো যুদ্ধদেবতা আরেসের সেবা আমি অবশ্যই

করব, তাঁকে সম্মান দেব। কিন্তু আমি কারো অধীন নই। এখানেই হোক, আর ট্রয়েই হোক, আমার স্বাধীনতা আমি অক্ষুণ্ণ রাখবই।

তুমি তোমার ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জনের হাতেই পেয়েছ নিষ্ঠুর দুঃখ। আমি এক সৈনিক, আমার পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব আমি করব। তোমার কন্যা, যাঁকে আমার বাগদত্তা বধূরূপে পরিচয় দিয়েছ, আমি বলছি, তাঁকে তাঁর পিতা হত্যা করতে পারবেন না। তোমার স্বামীর ঘৃণা ছলনায় আমাকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করতে দেব না। অন্যথায় আমারই নাম হবে ঘাতক, আমারই নাম তাঁর বুকে তরবারি হয়ে আঘাত করবে।

তোমার স্বামীই এই নিষ্ঠুরতার মূল, কিন্তু যদি তোমাকে এর জন্য দুঃসহ যন্ত্রণা, অবিশ্বাস্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়, যদি তোমার কন্যাকে মরতে হয় আমার জন্য, আমার সঙ্গে মিথ্যা বিবাহের অছিলায়, তাহলে আমার এ দেহ হবে দূষিত, অপবিত্র। যদি আমার নামের আড়ালে তোমার স্বামী এই নারী হত্যা করতে পারে তাহলে ধরে নিতে হবে যে এই সৈন্যদের মধ্যে আমার চেয়ে বড়ো কাপুরুষ আর নেই। আমি অপদার্থ, মেনেলাওস-ও মানুষ, আর আমি পেলেউসের সন্তান নই, কোনো এক পিশাচের পুত্র। আমি শপথ নিলাম জননী থেতিসের, পিতা নেরেউসের নামে, যাঁর জলতরঙ্গে আমি লালিত হয়েছি, তাঁর নামে বলছি, রাজা আগামেম-নোনের একটি আঙুলও তোমার কন্যার গাত্র স্পর্শ করতে সাহস করবে না। যদি করে তাহলে বর্বর সিপুলোস-ও সভ্য নগরী বলে সম্মানিত হবে, আর আমার রাজ্য ফ্থিয়া নামে কোনো নগর পৃথিবীতে থাকবে না। দৈবজ্ঞ কালখাস তার পূজার উপচারে পাবে অতি কটু তিক্ত স্বাদ। দৈবজ্ঞ! ভবিষ্যদ্বক্তা! কারা এই ভবিষ্যদ্বক্তা? অজস্র মিথ্যার মধ্যে হয়তো ভাগ্য ভালো থাকলে একটা কথা যাদের সত্য হয়, তারাই তো।

এসব কথা, তোমার কন্যাকে বধূরূপে পাবার জন্য আমি বলছি না। সহস্র কুমারী আমাকে পতিরূপে পাবার জন্য উদ্গ্রীব। কিন্তু রাজা আগামেমনোন আমাকে অপমানিত করেছেন। আমার নাম ব্যবহার ক'রে এই চক্রান্ত করার আগে আমাকে একবার অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। আমার নাম, আমার খ্যাতির জন্যই ক্লুতাইমনেস্ত্রা স্বেচ্ছায় সহাস্যে তাঁর মেয়েকে তুলে দিয়েছেন আগামেমনোনের হাতে। যদি ট্রয় যাত্রায় প্রয়োজন হত, আমি অবশ্যই আমার নাম ব্যবহার করতে দিতাম। আমার যুদ্ধক্ষেত্রের সহচরদের স্বার্থেই আমি সাহায্য করতাম। কিন্তু আগামেমনোন আমাকে তাঁর ইচ্ছামতো ব্যবহার করেছেন, যেন আমি কেউ নই, যেন আমার কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। অতএব এখন আগামেমনোনের কাছে আমার তরবারীর কিছু বক্তব্য আছে। যদি কেউ ভেবে থাকে তোমার কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে ট্রয়ে পৌঁছবার আগেই আমার তরবারী রক্তে লাল হয়ে উঠবে।

ধৈর্য ধরো। তোমার বিপদের দিনে তুমি আমাকে দেবতা বলে সম্বোধন করেছ। আমি দেবতা নই। কিন্তু আজ আমি তোমার জন্যে দেবতার মতোই হতে চাই।

কোরাস॥ তোমার যোগ্য কথা বলেছ, পেলেউসের পুত্র তুমি,
এই তো যোগ্য উক্তি সমুদ্রদেবতার সন্তানের।

ক্লুতা॥ কেমন করে তোমাকে সাধুবাদ জানাব। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মনে হবে চাটুকারিতা, সংক্ষিপ্ত ধন্যবাদ হবে কৃপণতা। তুমি তাতে বিরক্তই হবে। জানি যারা চাটুকারী তাদের মহতেরা ঘৃণা করে। নিজের দুঃখে বিলাপ করতে আমার লজ্জা হয়। এ দুঃখ একান্তই আমার, তোমার নয়। তবু যারা সৎ তারা মানুষের দুঃখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। যে দুঃখ তাদের নয়, তার ভার তারা বহন করে। আমাদের দুর্দশা করুণারই যোগ্য, আজ তুমি আমাদের করুণা করো।

ভেবেছিলাম তুমি হবে আমার জামাতা। নিষ্ফলা সে

আশা। আজ আমার সন্তান মৃত্যুতাড়িত। তুমি যখন কোনোদিন বিবাহ করবে হয়তো তখন এর ফলে কোনো অশুভ প্রভাব পড়বে তোমার জীবনে। তার জন্য তোমার প্রতিকার করা উচিত।

তুমি যা বলেছ সবই ঠিক। তুমি যদি রক্ষা করো তাহলেই শুধু আমার মেয়ে রক্ষা পাবে।

তুমি কি চাও সে তোমার কাছে এসে প্রার্থনা করবে, তোমার দুটি পা জড়িয়ে ধরবে? একজন কুমারীর পক্ষে তা করা কঠিন, তবু যদি তুমি খুশী হও, সে আসবে লজ্জায়, সংকোচে, নতচোখে। যদি তুমি আমার প্রার্থনায় সদয় হও, তাহলে তাকে অন্তঃপুরের বাইরে আসতে হয় না। আমার মেয়ে বড়ো বেশী লাজুক। নারীর লজ্জা তার সম্ভ্রম। নারীর লজ্জা তাই সম্মানের।

আখি ॥ না, না, তাকে এখানে এনো না। এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণই অজ্ঞ। তাকে কোনো কিছু বলারই দরকার নেই। এখানে সৈন্যদের ভীড়, তারা বহুদিন ঘরছাড়া। তারা এই ঘটনা নিয়ে নানা কথা বলবে, নানা কুৎসা ছড়াবে। তুমি অনুনয় করো বা না-করো আমার সিদ্ধান্ত একই থাকবে। আমার প্রধান কর্তব্য এখন তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা। তুমি আমার ওপর নির্ভর করো। আমি মিথ্যা বলি না, যদি বলি যদি তোমাকে প্রতারণা করি, যেন আমার সর্বনাশ হয়। যদি আমি বাঁচি তোমার কন্যাও বাঁচবে।

ক্লুতা ॥ আশীর্বাদ করি, বৎস তোমাকে আশীর্বাদ করি, পীড়িতকে ত্রাণ করার জন্য বারবার আশীর্বাদ করি।

আখি ॥ এখন আমার পরিকল্পনার কথা মন দিয়ে শোনো।

ক্লুতা ॥ বলো।

আখি ॥ প্রথমে আগামেমনোনকে বোঝাবার চেষ্টা করা যাক।

ক্লুতা ॥ সে কাপুরুষ। সৈন্যদের ভয়ে ভীত।

আখি ॥ যুক্তি দিয়েই যুক্তি খণ্ডন করতে হবে।

ক্লুতা ॥ ক্ষীণ আশা, তবু বলো, কি করব?

আখি ॥ প্রথমে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে যেন সে কন্যাকে হত্যা না করে। যদি অস্বীকার করে আমার কাছে এসো। যদি তুমি তাকে বোঝাতে পারো, নিরস্ত করতে পারো তাহলে আমাকে এ ব্যাপারে লিপ্ত হতে হয় না। যদি অস্ত্রের সাহায্য নিতে না হয়, যদি যুক্তির সাহায্যেই কাজ সিদ্ধ হয়, তাহলে তিক্ততার সৃষ্টি হয় না, সৈন্যরাও আমাকে দোষী করতে পারবে না।

ক্লুতা ॥ বেশ, যা ভালো মনে কর তাই করব। কিন্তু ধর, সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। তখন কোথায় তোমার দেখা পাব? আমার এই হতভাগ্য জীবনে কোথায় তোমার খোঁজে আসব বলে দাও।

আখি ॥ আমিই তোমায় খুঁজে নেব। এই সৈন্যদের জনারণ্যে তোমাকে খুঁজতে হবে না। এমন কিছু কোরো না যাতে তোমার পূর্বপুরুষদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। তুনদারেওসের খ্যাতি সারা গ্রীসে পরিব্যাপ্ত, তাঁর নাম যেন কলঙ্কিত না হয়।

ক্লুতা ॥ ঠিকই বলেছ। আমি তোমার আদেশ পালন করব, আমি তোমার দাসী। যদি দেবতা থাকেন তাঁরা তোমার সততার জন্য আশীর্বাদ করবেন। আর যদি দেবতারা না থাকেন, তাহলে জীবনে বিছুতেই কিছু এসে যায় না।

[ক্লুতাইমনেস্ত্রা, আখিল্লেস ও বৃদ্ধের প্রস্থান]

কোরাস ॥ একদিন কুমারীরা পেলিয়োন পাহাড়ের ধারে
বিবাহের গান গেয়েছিল
একদিন সানাইতে বেজেছিল বিবাহের সুর
সুরের ঢেউ উঠেছিল লায়ারে
বাঁশি হয়েছিল মাতাল
একদিন স্বর্গের নারীরা এসেছিল
সুসজ্জিতা, সুকুন্তলা
মাটিতে, বালিতে সোনালি পাদুকার চিহ্ন এঁকে
দেবতাদের সঙ্গে ভোজসভায়
পেলেউসের বিবাহ-উৎসবে,
ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের কলগুঞ্জন

অর্ধ-নরঃ, অর্ধ-অশ্ব কেনতাউরদের পাহাড়ী উপত্যকায়
বনে বনে,
সেদিন ছিল আইয়াকোসের পুত্রের সঙ্গে
থেতিসের বিবাহের দিন।

দারদানোসের পুত্র, গাহু মেদে
সোনালি পাত্রগুলি ভরে দিয়েছিল
উদ্বেল সুরায়।
ধবল উজ্জ্বল বালির ওপর নেরেউসের পঞ্চাশটি কন্যা
গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নেচেছিল
সেদিন।
এসেছিল কেনতাউরদের দল
ঘোড়ায় চেপে, পাতার মুকুট পরে, পাইনের সবুজ পাতা হাতে,
মদের দেবতা বাখুস
ভরে দিয়েছিলেন তাদের সুরাপাত্র
তারা উল্লসিত কণ্ঠে বলেছিল,
"নেরেউস দুহিতা,
তুমি যে সন্তানের জন্ম দেবে
সে হবে সারা থেস্‌মালির দীপ্তি
আপোল্লোর পূজারী জ্ঞানী খেইরোন এই কথা জানিয়েছেন।
তোমার পুত্র একদিন বর্ম আর বর্শা নিয়ে
মুরমিদোন সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে
যাত্রা করবে ট্রয়,
তার হাতেই হবে
প্রায়ামের মহিমান্বিত নগরীর পতন।
তার দেহ সুরক্ষিত রাখতে
দেবতা হেফাইস্‌তোস স্বয়ং
তৈরি করেছেন এক সোনার কবচ
এই কবচ তার জননী সাগরিকা থেতিসের উপহার।"
এইভাবে দেবতারা উদ্‌যাপন করেছিলেন

পেলেয়ুস ও নেরেইদের সন্তানের বিবাহরাত্রি
কিন্তু
ইফিগেনেইয়া—
পর্বত গুহা থেকে টেনে আনা
চিত্রল গো-বৎসকে বলি দেবার আগে
যেমন তার গলায় পরানো হয় পাতার মালা,
তোমার কুঞ্চিত কালো কেশে, ইফিগেনেইয়া
গ্রীক সৈন্যের দল ঢেকে দেবে সবুজ পল্লব
তোমার কুমারী-কণ্ঠ
প্লাবিত করে দেবে রক্তস্রোতে।

কিন্তু তুমি তো বড়ো হওনি পাহাড়ের গুহায়
মেষ পালকের বাঁশি আর রাখালের শিস শুনতে শুনতে
তুমি লালিত হয়েছ মায়ের কোলে
নদী দেবতা ইলাকোস, যিনি সমস্ত আর্গোসের আদি পিতা,
কোনো একদিন তাঁরই কোনো পুত্রের বধূ হবার জন্য
প্রস্তুত হচ্ছিলে তুমি।

হায়! কোথায় আজ
লজ্জার মহৎ মূর্তি
কোথায় ধর্ম
কোথায় ধর্মের প্রবল শক্তি!
অধর্ম বসেছে সিংহাসনে
মানুষ পরিত্যাগ করেছে ধর্ম
ন্যায়শূন্যতাই আজ ন্যায়
কোন্ নির্বোধ আজ দেবতাকে ভয় করে!

[ক্লুতাইমনেস্তার প্রবেশ]

ক্লুতা॥ আগ্যামেমনোন অনেকক্ষণ শিবিরের বাইরে। আমি তাকে খুঁজেছি। হতভাগিনী ইফিগেনেইয়া—সব জেনেছে। তার পিতার চক্রান্তের কথা, তার আসন্ন মৃত্যুর কথা। সে কখনও কাঁদছে। কখনও হাহাকার করছে।

ঐ যে তিনি এসেছেন। এখনই তার—নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধ প্রকাশ পাবে।

[আগামেমনোনের প্রবেশ]

আগা ॥ তোমার সঙ্গে একা একা কিছু বলার ছিল, মেয়ের সামনে নয়। তার শোনার মতো কথা নয়। তোমাকে এখানে একা পেয়ে ভালোই হল।

ক্লুতা ॥ কোন্ কথা বলার পক্ষে সময়টা এতো ভালো?

আগা ॥ শোন, তুমি ইফিগেনেইয়াকে বোল সে যেন আমার কাছে চলে আসে। উৎসবের পবিত্র জল তৈরী, পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দেবার জন্য যবশস্য প্রস্তুত, আর বিবাহের আগে যেসব গো-বৎসের কালো রক্তস্রোত আর্তেমিসের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে তারাও অপেক্ষা করছে।

ক্লুতা ॥ (জনান্তিকে) কী সুন্দর তোমার ভাষা। কিন্তু তোমার কাজ? (শিবিরের দিকে তাকিয়ে) এসো, ইফিগেনেইয়া, বাইরে এসো। তুমি তো পিতার পরিকল্পনার কথা ভালো করেই জানো, এসো, সঙ্গে নিয়ে এসো ওরেস্‌তেসকে, ভালো করে ঢেকে নাও ওকে। এসো।

[ইফিগেনেইয়ার প্রবেশ, সঙ্গে ওরেস্‌তেস]

ঐ তো তোমার মেয়ে, তোমার অনুগতা কন্যা।
এইবার আমি কিছু নিবেদন করতে চাই।

আগা ॥ ইফিগেনেইয়া, তোমার মুখ—মুখে হাসি নেই কেন? কাঁদছ? মাটির দিকে মুখ নীচু করে রেখেছ কেন? কেন চোখ ঢাকতে চাইছিস, ইফিগেনেইয়া!

ক্লুতা ॥ কীভাবে যে শুরু করি! এ এক দুঃখের কাহিনী, এর আদিতে দুঃখ, মধ্যে দুঃখ, এর শেষে দুঃখ।

আগা ॥ কি ব্যাপার? তোমরা সকলে যেন আমাকে দেখে আড়ষ্ট, যেন ভীত!

ক্লুতা ॥ যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও পুরুষের মতো।

আগা ॥ এই সুরে কথা বলছ কেন? কি জিজ্ঞাসা করতে চাও?

ক্লুতা ॥ এই ইফিগেনেইয়া—তোমার এবং আমার মেয়ে—একে কি তুমি হত্যা করবে স্থির করেছ?

আগা ॥ এ কী নিষ্ঠুর প্রশ্ন! এ কী অন্যায় সন্দেহ—আমি—

ক্লুতা ॥ উত্তেজিত না হয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

আগা ॥ সঙ্গত প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারি।

ক্লুতা ॥ আমার একটিই প্রশ্ন, তার একটিই উত্তর!

আগা ॥ হায়, অলঙ্ঘ্য স্বর্গের বিধান। হায় আমার হতভাগ্য।

ক্লুতা ॥ আমাদের তিনজনেরই হতভাগ্য।

আগা ॥ কে তোমাদের প্রতি অন্যায় করেছে? কে তোমাদের—

ক্লুতা ॥ আমাকে এই প্রশ্ন করছ তুমি? চাতুর্যেরও সীমা আছে।

আগা ॥ (স্বগত) সর্বনাশ হয়েছে আমার। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

ক্লুতা ॥ আমি সব জানি। জানি তুমি কি করতে চাও। মৌনতাই তোমার স্বীকারোক্তি। তোমার অর্থহীন আর্তনাদই অর্থময় ভাষা। কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

আগা ॥ ঠিক, আমি আর কিছু বলব না। মিথ্যার প্রয়োজন শেষ হোক। আমি দুর্ভাগা, আর নির্লজ্জ হতে চাই না আমি।

ক্লুতা ॥ শোন, আমি সহজ ভাষায় বলছি, কোনো ধাঁধা নয়, কূটচাল নয়, কথা শোন। তোমাকে আমার প্রথম তিরস্কার: তুমি আমাকে বিবাহ করেছিলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমার স্বামী তান্‌তালোসকে তুমি হত্যা করেছিলে। আমার বুক থেকে রূঢ় হাতে আমার শতপুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে পায়ের তলায় পিষে মেরেছিলে। আমার দুই ভাই, জেউসের দুই পুত্র, তাদের উজ্জ্বল অশ্বে চেপে তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতা তুনদারেয়োস তোমাকে রক্ষা করেছিলেন, তুমি তাঁর শরণ নিয়েছিলে। আর শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে পেয়েছিলে পত্নীরূপে।
ধীরে ধীরে আমিও তোমাকে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম।
স্বীকার করবে নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীরূপে কখনও তোমার এবং তোমার বংশের কোনো নিন্দার কারণ হইনি। আমার ভালো-বাসার দাবী ছিল চিরকালই পরিমিত। আমি তোমার সুখকে

সমৃদ্ধ করেছি, যখনই তুমি ঘরে ফিরেছ পেয়েছ সুখ, যখনই ঘরের বাইরে গেছ, গেছ নির্বিঘ্নে। পুরুষের ভাগ্যে যথার্থ সহধর্মিণী বড়ো দুর্লভ, তুমি সেই দুর্লভকেই পেয়েছ।

আমি তোমার এক পুত্র ও তিন কন্যার জননী। তাদের এক-জনকে তুমি নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাও। কেউ যদি জানতে চায়, কেন তুমি তাকে হত্যা করতে চাও, কী উত্তর দেবে তার? আমি তার কী উত্তর দেব? যাতে মেনেলাওস হেলেনকে ফিরে পায় সেইজন্য?

নিজের সন্তানকে বিসর্জন দেবে একটা বেশ্যার জন্য? প্রিয়জনের বদলে ঘরে আনবে এক ঘৃণিতাকে? কী চমৎকার বিনিময়!

ভেবে দেখ, তুমি যাবে যুদ্ধে, সমুদ্রপারে, আমি থাকব একা, দীর্ঘদিন তোমাকে ছেড়ে, ভেবে দেখ আমার কথা! আমি প্রাসাদের এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে ঘুরে বেড়াব, শূন্য প্রাসাদ। আমার মেয়ের শয়নকক্ষ শূন্য, চিরদিনের জন্য, আমি বসে থাকব একা একা, কর্মহীন, চোখের জলে ভেসে বিলাপ করব, "আমার হতভাগিনী মেয়ে, তোকে হত্যা করেছে সে, যে তোকে জন্ম দিয়েছিল; তোকে হত্যা করেছে তোর পিতার হাত, অন্য কেউ নয়। পিতার কাছ থেকে এই তোর উপহার।"

তাহলে, আমি এবং তোমার সন্তানেরা, যেদিন তুমি ফিরে আসবে তোমার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করতে বাধ্য হব। দেবতাদের দোহাই, তোমার প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে তার থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য কোরো না। তুমিও কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ো না আমাদের প্রতি।

যখন তুমি তোমার মেয়েকে হত্যা করবে, তখন কোন্ মন্ত্র উচ্চারণ করবে তুমি? যখন তার কণ্ঠে ছুরি বসিয়ে দেবে, কামনা করবে তার জন্য কোন আশীর্বাদ? লজ্জাহীন অপরাধীর মতো ঘর ছাড়বে সে কি শুধু যন্ত্রণাময় প্রত্যাবর্তনের জন্য? তোমার মঙ্গল কামনা করব? তা কি সংগত? হত্যাকারীর জন্য প্রার্থনা করব? দেবতারা কি এত হৃদয়হীন?

যখন তুমি আবার স্বদেশে, আর্গোসে ফিরবে, তখন কি তোমার সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরবে? ঈশ্বর না করুন, তোমার কোনো সন্তান কি তোমার দিকে তাকাতে সাহস করবে? তারা কি ভাববে না তোমার আলিঙ্গন কোন হত্যার আয়োজন?

তুমি কি এসব কথা ভেবেছ? না, তোমার একমাত্র চিন্তা বাহুবলের প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্বপদে টিকে থাকা? গ্রীকসৈন্যদের তোমার বলা উচিত নয় কি, যদি টুয়ে যেতে চাও, ভাগ্যপরীক্ষা হোক, দেখ, কার কন্যাকে মরতে হয়! সেই ব্যবস্থা হবে ন্যায়-সংগত। কিন্তু তুমি কেন নিজের মেয়েকে বলি দেবে গ্রীকদের জন্য? মেনেলাওস-ই বা কেন তার মেয়ে হেরজিয়োনকে বলি দেবে। যুদ্ধ যদিও হেলেনের জন্য তবু তা সংগত নয়। আমি তোমার প্রতি চিরবিশ্বস্ত, কিন্তু আমি আমার মেয়েকে হারাব, আর যে তার স্বামীর শয্যাকে কলঙ্কিত করেছে তার সন্তান থাকবে সুখে, নিরাপদে, স্পার্টায়! উত্তর দাও, যদি ভুল বলে থাকি বলো। আর যদি সত্য বলে থাকি, আমার মেয়েকে হত্যা কোরো না। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করো, অবিবেচক হয়ো না।

কোরাস॥ শোনো, আগামেমনোন
শোনো, রানীর কথা শোনো
রক্ষা করো সন্তানের জীবন
তাই ধর্ম, তাই কর্তব্য।

ইফিগেনেইয়া॥ বাবা! যদি আমার অরফেউসের মতো শক্তি থাকতো, তাঁর গানে পাষাণও মুগ্ধ হতো, যদি কথা দিয়ে মানুষকে বশীভূত করতে পারতাম, তাহলে হয়তো সেই শক্তির প্রয়োগ করতাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার একমাত্র শক্তি, একমাত্র আমার কলা আমার অশ্রুজল। সেই অশ্রু তোমাকে নিবেদন করি।

আমার জননী আমাকে যে শরীর দিয়েছেন সেই শরীর দিয়ে পরাশ্রয়ী লতার মতো আমি তোমার জানু দুটি জড়িয়ে ধরছি। আমার দিন ফুরোবার আগে আমাকে হত্যা কোরো না।

কী মধুর এই পৃথিবীর আলো, আমাকে পৃথিবীর গর্ভের অন্ধকারের মধ্যে পাঠিও না।

আমি তোমাকে প্রথম পিতা বলে ডেকেছি, আমি তোমার প্রথম সন্তান। আমিই প্রথম তোমার জানুতে মাথা রেখে বিশ্রাম করেছি, আমরা দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছি। তুমি বলতে, 'তুই কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামীর ঘর করছিস, সে কি আর আমি দেখে যেতে পারব', তখন তোমার চিবুক ছুঁয়ে বলতাম, যেমন করে আজ তোমার চিবুক স্পর্শ করছি, "তখন তোমার জন্য কত কি করব, বাবা! তুমি বুড়ো হবে, আমার বাড়িতে আসবে, তুমি এতদিন ধরে আমার জন্যে কত করেছ। এবার আমার করার পালা।" এসব কথা কি তোমার মনে আছে? তুমি ভুলে গেছ!

তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও। ওঃ না, না, না, পেলোপ্‌সের নাম করে বলছি, তাঁর দোহাই, তোমার পিতা আত্রেউসের দোহাই, আমার মায়ের দোহাই— ছাখো. একদিন আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর যে যন্ত্রণা হয়েছিল, আজ সেই যন্ত্রণায় তিনি বিকল। প্যারিস আর হেলেনের প্রেমের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? কেন হেলেনের আগমন মানে আমার প্রস্থান?

যদি আমার কথায় কান দিতে না-চাও, আমার দিকে তাকাও, বাবা। তোমার দৃষ্টি আমার মুখের ওপর পড়ুক, অন্ততঃ আমার মৃত্যুর সময় এই স্মৃতিটুকু থাক।

ছোটো ভাইটি আমার, তুই এখন ছোটো, তুই আমার জন্য কিছুই করতে পারবি না তুই আমার সঙ্গে কাঁদ, বাবার কাছে কেঁদে বল যেন তোর দিদিকে তিনি তোর কাছ থেকে কেড়ে না নেন।

ছাখো ছাখো, শিশুরও বোধ আছে, তারো দুঃখ আছে। তার কোন ভাষা নেই, তবু ঐ কান্নার শব্দ দিয়ে, সে তোমাকে অনুনয় করছে, বাবা।

আমার প্রতি করুণা করো। এই যৌবনে আমাকে মরতে বোলো না। তোমার চিবুক স্পর্শ করছি, তোমার জানু স্পর্শ করছি, আমরা প্রার্থনা করছি— একজন শিশু, একজন কুমারী কন্যা। আমি বলতে চাই, মধুময় পৃথিবীর আলো, পৃথিবীর গহ্বরে

মৃত্যুপুরীতে শুধু শূন্যতা। সাধ করে মরতে চায় শুধু উন্মাদ, তুচ্ছতম জীবনও মহান মৃত্যুর চেয়ে ভালো।

কোরাস॥ হায় রে, পাপীয়সী হেলেন, হায়!
তোমারই জন্য
তোমার প্রেমের জন্য
আজ
আত্রেউসের পুত্রদের জীবনে
তাদের পুত্রদের জীবনে
নেমে এসেছে
কঠিন পরীক্ষা।

আগামেমনোন॥ জানি নিষ্ঠুরতা কি, জানি দয়া কি! আমি উন্মাদ নই, আমিও সন্তানকে ভালোবাসি। এ কাজ করা ভয়াবহ, এ কাজ না-করা আরো ভয়াবহ। আমি নিরুপায়!

ছাখো, কত যুদ্ধ জাহাজ শত শত, সমুদ্রতীরে ছাখো, অসংখ্য সৈনিক। যদি না এই আহুতি দেওয়া হয়, তারা ইলিয়োনের দিকে যাত্রা করতে পারবে না, ট্রয়ের রাজপুরী পদানত করতে পারবে না। এক বিবাহিতা গ্রীক নারীর অপহরণের প্রতিশোধ নেবার জন্য গ্রীক সৈন্যেরা এখন উন্মত্ত, তারা সেই বিদেশীর রাজ্যে যেতে চায় দ্রুতগতিতে, অবিলম্বে। আমি যদি দৈববাণীর নির্দেশ পালন না করি, তারা আর্গোসে গিয়ে আমার অন্য সন্তানদের হত্যা করবে, এখানে তোমাকে হত্যা করবে, আমাকেও। আমি মেনেলাওসের ভৃত্য নই, তার ইচ্ছায় চালিত নই, কিন্তু আমার ইচ্ছায় কিছু এসে যায় না। তোমাকে আহুতি দিতে আমাকে বাধ্য করছে সমস্ত গ্রীস।

গ্রীস স্বাধীন থাকুক, তার জন্য তোমার সাহায্য চাই। আমরা গ্রীক, বিদেশীরা আমাদের নারীর অসম্মান করবে, আমাদের নারী অপহরণ করবে, আমরা তা হতে দিতে পারি না।

[আগামেমনোনের দ্রুত প্রস্থান]

ক্লুতা॥ ওগো, মেয়েরা! আমি তোমাদের পরিচিত নই, তবু বলছি, দেখছ তোমরা! আমার মেয়ে, সামনে তার মৃত্যু। দেখে যে

বুক ফেটে যায়। তোকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে তোর পিতা দ্রুত চলে গেল।

ইফি॥ এ কী ভাগ্য মা, আমার! এ কী দুঃখ! একই দুঃখের তারে আমরা দুজনেই বাঁধা। আমার জন্য এই পৃথিবীর আলো আর নয়, আর নয় এই সূর্য। মাগো, মা, একদিন প্রায়াম তার সন্তান প্যারিসকে মায়ের বুক থেকে টেনে নিয়ে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়েছিল সেই ফ্রুগিয়ার বরফঢাকা মাঠে, ইদা পাহাড়ের ধারে। আজ মনে হয়, যদি কোনো রাখাল সেদিন তাকে লালন না করত, আলেকজাণ্ডার প্যারিসে যদি কোথাও আশ্রয় না পেত, যে ঝর্নার উচ্ছল জলস্রোতে অপ্সরাদের দল খেলা করে সেখানে যদি সে কোনোদিন না যেত, যেখানে বুনো গোলাপ আর হায়াসিন্থের গন্ধভরা অরণ্য, যেখানে স্বর্গ থেকে ফুল তুলতে আসেন দেবীরা, সেখানে যদি তার পা না পড়ত। সেইখানেই তো এসেছিলেন একদিন তিন দেবী, পাল্লাস, চতুরা কুগ্রিস আর দূতী হেরমেসকে সঙ্গে নিয়ে হেরা। কুগ্রিসের গর্ব সে মানুষের মনে জ্বালিয়ে দিতে পারে তীব্রতম কামের আগুন, পাল্লাসের গর্ব তার বর্শার শক্তিতে, আর হেরার গর্ব সে সর্বশক্তিমান জেউসের শয্যাসঙ্গিনী।

তারা এসেছিল এক ঘৃণ্য বিচারের জন্য, কে সবচেয়ে সুন্দর তাই নিয়ে দ্বন্দ্ব আর তারই বিচার। তার পরিণামই আমার মৃত্যু। আর তাই হল গ্রীসের গৌরব। ইলিয়োনে যাত্রার জন্য তাই আমাকেই করতে হবে প্রথম আত্মদান। মা, মাগো, আমার জন্মদাতা আমাকে মরণের হাতে পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। যেদিন আমি হেলেনকে প্রথম দেখেছিলাম, অভিশপ্ত সেই দিন। হেলেন, পাপীয়সী হেলেন আমার অভিশাপ। এক ধর্মহীন পিতার ধর্মহীন ছুরিকায় আমার মৃত্যু।

যদি কোনোদিন ট্রয়মুখী এই জাহাজের সারি না আসত আউলিসের শান্ত বন্দরে, যদি জেউস এউরিপোসের সমুদ্রে এদের রুদ্ধ করে না রাখতেন, কার ক্ষতি হত! তিনি তো নাবিকদের জন্য পাঠান অনুকূল বাতাস, সুখের বাতাস। কত

বাতাসের অধিপতি তিনি, দুঃখের বাতাস, ক্লেশের বাতাস। কোনো হাওয়া পালে লাগলে, নৌকো এগিয়ে যায় সহজে, কখনও হাওয়া যায় থেমে, নৌকো আশ্রয় নেয় বন্দরে। কখনও কোথাও কোনো হাওয়া নেই, তখন শুধু প্রতীক্ষা, এগোবার পথ নেই।

দুঃখেই আমাদের জন্ম, কয়েকদিনের ক্ষীণপ্রাণ মানুষ; দুঃখেই আমাদের আবর্তন, দুঃখেই আমাদের অবসান। তুনদারেসের বংশধরেরা আজ গ্রীসের জীবনে কী বিশাল দুঃখের ভার, কী বিহ্বল বেদনা এনেছে মা!

কোরাস॥ কিন্তু এ দুঃখ অসংগত
এ দুঃখ অন্যায়
এ তোমার প্রাপ্য নয়।
আমাদের মন তোমার জন্য
ব্যথায় ভরে উঠেছে।

ইফি॥ মা, অনেকে এইদিকে আসছে, দেখতে পাচ্ছ।

ক্লুতা॥ আখিল্লেস, দেবপুত্র আখিল্লেস, যাঁর নাম করে তোমাকে আনা হয়েছে।

ইফি॥ আমি যাই, আমি লুকিয়ে পড়ি।

ক্লুতা॥ কেন পালিয়ে যেতে চাস!

ইফি॥ আখিল্লেসের সামনে দাঁড়াতে আমার লজ্জা হয়।

ক্লুতা॥ কেন?

ইফি॥ লজ্জা, এ দুর্ভাগা বিবাহের কথায় লজ্জা।

ক্লুতা॥ এখন লজ্জার সময় নেই রে। এখানে দাঁড়া, যদি কিছু করা যায়— [আখিল্লেসের প্রবেশ]

আখি॥ তুমি লেদার দুহিতা, তুমি আজ দুঃখিনী জননী

ক্লুতা॥ এই আমার যথার্থ পরিচয়। [বাইরে চীৎকার শোনা যায়]

আখি॥ সৈন্যেরা উত্তেজিত, তাদেরই চীৎকার।

ক্লুতা॥ কিসের জন্য উত্তেজনা?

আখি॥ তোমার কন্যার জন্য।

ক্লুতা॥ তোমার কথায় যেন বিপদের সংকেত পাচ্ছি।

আখি ॥ ওরা তোমার কন্যার বলি চায়।

ক্লুতা ॥ কেউ কি এদের বিরোধিতা করবে না?

আখি ॥ আমিও বিপন্ন।

ক্লুতা ॥ কি বিপদ?

আখি ॥ ওরা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চাচ্ছে।

ক্লুতা ॥ আমার কন্যাকে রক্ষা করার চেষ্টার জন্য?

আখি ॥ ঠিক।

ক্লুতা ॥ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি কার আছে?

আখি ॥ সমস্ত গ্রীকসৈন্য আমার বিরুদ্ধে।

ক্লুতা ॥ তোমার নিজের সৈন্যদল? মুরমিদোন সৈন্য?

আখি ॥ তারাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

ক্লুতা ॥ হায়! সব আশা নিভে গেল।

আখি ॥ এরা আমায় ধিক্কার দিচ্ছে, বলছে আমি স্ত্রৈন।

ক্লুতা ॥ তুমি কি উত্তর দিয়েছ ওদের।

আখি ॥ আমার বধূকে তারা হত্যা করতে পারবে না।

ক্লুতা ॥ আশীর্বাদ করি।

আখি ॥ বলেছি তাঁর পিতা এই কন্যাকে আমার হাতে দিতে মনস্থ করেছেন—

ক্লুতা ॥ এবং আর্গোস থেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

আখি ॥ কিন্তু তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে আমার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

ক্লুতা ॥ বুদ্ধিহীন উন্মত্ত জনতা।

আখি ॥ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের রক্ষা করব।

ক্লুতা ॥ তুমি একা? সমস্ত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে?

আখি ॥ (অস্ত্রবাহকদের দেখিয়ে) এই অস্ত্রবাহকেরা আছেন আমার সঙ্গে।

ক্লুতা ॥ স্বর্গ তোমার বীরত্বের পুরস্কার দিক।

আখি ॥ স্বর্গের পুরস্কার অবশ্যই নিশ্চিত।

ক্লুতা ॥ তাহলে? আমার মেয়ে— সে কি রক্ষা পাবে? তাকে হত্যা করা হবে?

আখি ॥ আমার সম্মতিতে নিশ্চয়ই নয়।

ক্লুতা ॥ কেউ কি আমার মেয়েকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে—

আখি ॥ আসছে। ওডুস্‌সেউসের নেতৃত্বে একদল সৈন্য—

ক্লুতা ॥ সিসুফোসের বংশধর ওডুস্‌সেউস!

আখি ॥ সেই।

ক্লুতা ॥ স্বেচ্ছায়? না সৈন্যদের তাড়নায়?

আখি ॥ সৈন্যরা তাকে নির্বাচন করেছে। সে তাদের ইচ্ছুক ভৃত্য।

ক্লুতা ॥ কলঙ্কময় নির্বাচন! হত্যার জন্য নেতৃত্ব!

আখি ॥ কিন্তু আমি তাকে বাধা দেব।

ক্লুতা ॥ সে কি আমার মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাবে?

আখি ॥ তার সোনালি চুল ধরে।

ক্লুতা ॥ আমি তখন কি করব তাহলে?

আখি ॥ তুমি তাকে জড়িয়ে থেকো।

ক্লুতা ॥ কিন্তু তাতে কি সে বাঁচবে?

আখি ॥ কিন্তু তখন তুমি শুধু তাই করবে।

ইফিগেনেইয়া ॥ তোমরা আমার কথা শোনো। আমি এখন বুঝতে পারছি তুমি তোমার স্বামীর প্রতি অকারণে ক্ষুব্ধ হয়েছ। যা অনিবার্য তাকে বাধা দেওয়া বৃথা।

এই অপরিচিত যুবকের উদ্দীপনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, তার প্রশংসা করি। কিন্তু দেখা দরকার যাতে সৈন্যবাহিনী তার বিরুদ্ধে না যায়। তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই, কিন্তু এই যুবকের সমূহ ক্ষতি।

মা, আমার কথা শোনো, আমি মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সগৌরবেই মৃত্যু বরণ করব। মন থেকে সব তুচ্ছ, সব ছোটো চিন্তা আমি বাদ দিলাম। মা তুমি বোঝার চেষ্টা করো, আমি ঠিকই করছি। আজ সমস্ত গ্রীস আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই সব জাহাজ সমুদ্রযাত্রা করতে পারবে কিনা, ট্রয়ের পতন হবে কিনা, সব নির্ভর করছে আমার ওপর। আমারই ওপর নির্ভর করছে গ্রীসের নারীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। যখন প্যারিস হেলেনের অপহরণের প্রতিফল পাবে, বিদেশীরা আর কোনোদিন আমাদের নারী হরণ করতে সাহসী হবে না। এ আমি অর্জন

করব, আমার মৃত্যুর বিনিময়ে। গ্রীস হবে বিপন্মুক্ত, আমার নাম হবে ধন্য। জীবনের প্রতি তাই আমি আর লুব্ধ নই। তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছিলে গ্রীসেরই মঙ্গলের জন্য। দেশ বিপন্ন, দশসহস্র সৈনিক সজ্জিত, দশ সহস্র নাবিক দাঁড় হাতে প্রতীক্ষমান। তারা সাহসী, তারা শত্রুকে আঘাত করতে দৃঢ় পরিকর, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তবু আমি বাদ সাধব সেখানে? সে কি সংগত? এই মৃত্যুপথযাত্রীদের কি উত্তর দেব আমি? আর একটি কথা—

একজন নারীর জন্য একজন যুবকের সমগ্র সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ সংগত নয়। দশ সহস্র নারীর চেয়েও এই যুবকের জীবন অনেক বড়ো। যদি আর্তেমিস আমার এই শরীরটা চান, আমি এক সাধারণ মানবী, আমি কি তাঁকে বাধা দিতে পারি। আমার এই শরীর আমি গ্রীসকে দান করলাম।

নাও, আমাকে নাও, আমাকে হত্যা করো; ধ্বংস করো ট্রয়। চিরকালের জন্য সেই হবে আমার স্মৃতিসৌধ, সেই আমার বিবাহ, আমার সন্তান, আমার খ্যাতি। মা, গ্রীকরাই শাসন করবে বিদেশীদের, বিদেশীরা গ্রীকদের নয়। ওরা জন্মসূত্রে চির পরাধীন, গ্রীস চির স্বাধীন।

কোরাস ॥ গৌরব দীপ্ত তোমার কণ্ঠস্বর
গৌরবদীপ্ত তোমার বাণী, কুমারী কন্যা!
এ সবই অদৃষ্ট
সবই দেবতার নিষ্ঠুর বিধান

আখি ॥ আগামেমনোন-দুহিতা, যদি তোমাকে আমার পত্নীরূপে পেতাম, বুঝতাম সত্যিই বুঝি কোনো দেবতা আমার মঙ্গল চেয়েছিলেন। গ্রীস ধন্য, কারণ তুমি গ্রীসের। তুমিও ধন্য, কারণ গ্রীস তোমার। তোমার বাণী মহৎ, তোমার দেশেরই যোগ্য। দেবতারা অনেক শক্তিমান, তাই তুমি তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাও না, অনিবার্যকেই তুমি মেনে নিলে। আজ তোমার এই মহৎ রূপ দেখে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইছে।

তবু বলছি, আমি তোমাকে রক্ষা করতে চাই। আমি নিয়ে যেতে চাই তোমাকে আমার ঘরে। আমার জননী থেতিস সাক্ষী থাকুন— আমি যদি সমস্ত গ্রীসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করি, যদি তোমাকে রক্ষা না করি, আমার সমস্ত গৌরবের যেন অবসান হয়। মৃত্যু বড়ো ভয়ংকর, তুমি মৃত্যু কামনা কোরো না।

ইফি ॥ আমি যা বলছি তাতে কারো ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই। তুনদারেওসের কন্যা হেলেন আনবে অনেক সংঘাত, অনেক মৃত্যু, সবই তার সুন্দর দেহের জন্য। অপরিচিত যুবক, তুমি আমার জন্য প্রাণ দিও না, আমার জন্য কারো প্রাণ নিও না। গ্রীসকে যদি বিপন্মুক্ত করতে পারি, আমাকে তুমি বাধা দিও না।

আখি ॥ তুমি মহাপ্রাণ! এই যদি হয় তোমার অটল সিদ্ধান্ত, আমি আর কি বলব! তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে এক গভীর মহিমা। কে আজ তা অস্বীকার করবে? তবু, তবু বলছি, যদি তুমি সিদ্ধান্ত বদল কর, আমি জানিয়ে রাখি, উৎসর্গবেদীর পাশেই আমি আমার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকব তোমার মৃত্যুকে বাধা দিতে, প্রস্তুত থাকব তোমার রক্ষা করতে; ঘাতকের তরবারী যখন তোমার কণ্ঠের অতি সন্নিকটে আসবে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রস্তুত থাকব। কোনো উন্মাদ ভাবোচ্ছ্বাসে আমি তোমাকে মরতে দেব না। আমি চললাম দেবীর মন্দিরে। সেইখানে আমি তোমার প্রতীক্ষা করব। [অস্ত্রবাহকগণ সহ আখিল্লেসের প্রস্থান]

ইফি ॥ মা, তুমি নীরব, তোমার চোখ জলে ভরা, আমার জন্য কাঁদছ?

ক্লুতা ॥ সারা বুকে আমার যন্ত্রণা, কান্নার এত অধিকার আজ আর কার?

ইফি ॥ না, মা, দুর্বল করে দিও না আমাকে। আমার একটা কথা শুনবে, মা?

ক্লুতা ॥ তোর সব কথাই আমি শুনব, বল কি কথা!

ইফি ॥ আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য শোক কোরো না, কোনো কালো পোশাক পোরো না, তোমার ঐ অলকগুচ্ছ আমার জন্য যেন কেটো না।

ক্লুতা ॥ তোকে হারিয়েও আমি শোক করব না? কি কথা বলছিস তুই?

ইফি ॥ না, আমাকে তো তুমি হারাবে না। মৃত্যু থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি, আমার জীবন তোমার গৌরব।

ক্লুতা ॥ না, তুই না থাকলে কোথায় তোর জীবন? তোর জন্য শোক নয়?

ইফি ॥ কোনো শোক নয়! কোনো সমাধি নয়!

ক্লুতা ॥ সমাধি তো শোক নয়! শোক তো মৃতের জন্য, যে চলে গেল তার জন্য!

ইফি ॥ জেউস-কন্যা আর্তেমিসের বেদীই আমার সমাধি। সেখানে অশ্রুপাত নিষিদ্ধ।

ক্লুতা ॥ বেশ!
আমি তোর নির্দেশ পালন করব।

ইফি ॥ আমি দেবতাদের আশীর্বাদধন্য। আমি গ্রীসের কল্যাণ।

ক্লুতা ॥ কি বলব আমি তোর বোনদের?

ইফি ॥ তারা যেন কালো পোশাক না পরে, শোক না করে।

ক্লুতা ॥ আর কোনো কথা?

ইফি ॥ তাদের বোলো আমি যাচ্ছি, ওরেসতেস যেন ভালো থাকে, বড়ো হয়।

ক্লুতা ॥ এই তোর শেষ দেখা, নে, ওকে একবার বুকে নে।

ইফি ॥ (ওরেসতেসকে বুকে জড়িয়ে ধরে) আ! তুই আমাকে কত ভালোবাসিস!

ক্লুতা ॥ তোর জন্য কিছু করব? আর্গোসে? তোর কোনো ইচ্ছে? কোনো সাধ?

ইফি ॥ আমার পিতাকে ঘৃণা কোরো না। তিনি তোমার স্বামী!

ক্লুতা ॥ আঃ তোর মৃত্যুর জন্য তাকে এক কঠিন পথের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

ইফি ॥ কিন্তু মা, স্বেচ্ছায় নয়, গ্রীসের জন্যই তিনি আমাকে আহুতি দিচ্ছেন।

ক্লুতা ॥ বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, আত্রেউস-কুলের অযোগ্য কুলধর।

ইফি ॥ আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবার আগেই আমি দেবীর বেদীমূলে যেতে চাই। আমি প্রস্তুত, কে আমাকে নিয়ে যাবে?

ক্লুতা ॥ আমিও যাব, তোর সঙ্গে, আমিও যাব— [অনুচরদের প্রবেশ]

ইফি ॥ না, মা, না—

ক্লুতা ॥ আমি তোকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখব—

ইফি ॥ মা, শোনো, তুমি এখানেই থাকো। আর্তেমিসের কুঞ্জবনে যেখানে উৎসর্গের আয়োজন করা হয়েছে, আমার পিতার অনুচরেরা আমাকে সেখানে নিয়ে যাক।

ক্লুতা ॥ তুই যাচ্ছিস!

ইফি ॥ চিরদিনের জন্যে মা।

ক্লুতা ॥ মাকে ছেড়ে চলে যাবি।

ইফি ॥ আমি দৃঢ় মনেই যাচ্ছি মা।

ক্লুতা ॥ ওরে থাম্, থাম্, যাসনি, আমাকে ফেলে—

ইফি ॥ আর বিলাপ নয়, তোমরা তরুণীরা এসো, আমার অদৃষ্টের জন্য শুভ কামনা করো, আরম্ভ করো কুমারী আর্তেমিসের বন্দনা গান। গ্রীক শিবিরে নামুক পবিত্র নিস্তব্ধতা। নিয়ে এসো পূজার ডালি, জ্বালিয়ে দাও অগ্নিশিখা, নিয়ে এসো যব শস্য। আমার পিতা বেদীর বাম দিক থেকে দক্ষিণে বৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ আরম্ভ করুন। গ্রীসের মুক্তি, গ্রীসের বিজয়ের জন্য আমি আসছি। চলো, তোমরা অগ্রসর হও।
আমি ধ্বংস করব ইলিয়োন। ট্রয় পরাজিত হবে আমার হাতে। আমার মাথায় জড়িয়ে দাও ফুলের মালা, আনো পবিত্র ঝর্নার জল। আর্তেমিসের মন্দির ঘিরে, বেদী আবর্তন করে দেবতার সম্মানে আরম্ভ হোক পূজা-নৃত্য। তাঁর দৈবাদেশ আমি পূর্ণ করব রক্তধারায়। হে জননী, হে দিব্য জননী আমাদের চোখ অশ্রুভরা— জানি তোমার বেদীতটে অশ্রুপাত নিষিদ্ধ— এই অশ্রু তোমাকে দিলাম।
এসো এসো, আমার সঙ্গে গান ধরো, ধন্য আর্তেমিস ধন্য। কালখিস বন্দরে জাহাজের দল প্রতীক্ষমান। দূরে আর্তেমিসের মন্দির। অবিক্ষুব্ধ শান্ত, আউলিস সমুদ্রতীরে রণতৃষ্ণায় অধীর নাবিকের দল, সব আমার জন্য।
কোথায় আজ আমার সেই ঘর, সেই পেলাসগিয়া, সেই মুকেনায়—

কোরাস ॥ মনে পড়ছে তোমার দেশের কথা ?

ইফি ॥ আমার দেশ আমাকে গ্রীসের মশাল করে তুলেছে। আমি আজ মৃত্যুতে নির্ভয়।

কোরাস ॥ চির অম্লান হোক তোমার গৌরব

ইফি ॥ (আর্তস্বরে) হে আলোক, তুমি নিয়ে এসেছ দিনের সঙ্কেত
জেউসের উদ্ভাসিত জ্যোতি !
আমি যাত্রা করছি এক জীবন থেকে অন্য জীবনে,
এক ভাগ্য থেকে অন্য অদৃষ্টে
এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে।
আলো, তুমি আমার প্রিয় !
বিদায়, মর্ত্যের আলো।

[ইফিগেনেইয়াকে নিয়ে অনুচরদল চলে যায়। ক্লুতাইমনেস্ত্রা শিশু ওরেসতেসকে নিয়ে ভেতরে যায় আর্তনাদ করতে করতে]

কোরাস ॥ ঐ, ঐ যে, সে যায় !
যার হতে ট্রয় পরাজিত হবে
যার হাতে রচিত হবে ইলিয়োন রাজপ্রাসাদের
ধূলিশয্যা, চিতা,
ঐ যে সে যায় !

ঐ যে সে চলেছে
কুন্তলভরা ফুলের মালায়
মাথায় ঝরছে পবিত্র জল
চলেছে সে সর্বনাশিনী দেবীর পূজা বেদীতে
ভরে দিতে রক্ত,
যার বঙ্কিম গ্রীবায়
এখনই নেমে আসবে শানিত কৃপান
ঐ যে সে যায় !

তার পিতা
পবিত্র ঘট, পবিত্র জল নিয়ে প্রতীক্ষায়,

প্রতীক্ষায় সৈন্যের দল
ট্রয় যাত্রার জন্য মত্ত, অধীর।

এসো সবাই বন্দনা গান গাই
জেউস-দুহিতা আর্তেমিসের কাছে প্রার্থনা করি
তাঁর আশিসের জন্য,
মঙ্গল হোক
ধন্য হোক তার অদৃষ্ট,
হে ভীষণা দেবী
মানুষের উষ্ণরক্তে প্রসন্ন হও।
বিশ্বাসঘাতী ট্রয়ের অভিযান
নির্বাধ হোক
আগামেমনোন বর্শার মুখে গেঁথে আনুক
গ্রীসের জয়
তার কপালে আঁকা হোক
গ্রীসের গৌরব।

[দ্রুতগতিতে দূতের প্রবেশ]

দূত ॥ ক্লুতাইমনেস্ত্রা !
তুনদারেয়োস-কন্যা, ক্লুতাইমনেস্ত্রা, বাইরে এসো, সংবাদ আছে, বাইরে এসো।

ক্লুতাইমনেস্ত্রা ॥ কেন ডাকছ আর ! আমি শোকে বিধ্বস্ত, ভয়ে কাঁপছি। আর কোন্ দুঃখের সংবাদ নিয়ে এল দূত ! বলো !

দূত ॥ তোমার সন্তানকে স্পর্শ করে বলছি, না, কোনো শোক সংবাদ নয়। তোমাকে এক অদ্ভুত, আশ্চর্য কথা বলতে এসেছি।

ক্লুতা ॥ বলো, দেরি কোরো না।

দূত ॥ তোমাকে সব বলছি, রানী। সব কথা বলছি, একেবারে গোড়ার থেকে। আমরা যখন জেউস-দুহিতা কুঞ্জে তাঁর ফুলভরা উপবনে পৌঁছলাম, তোমার কন্যাকে আনা হোল সৈন্যবাহিনীর সামনে। রাজা আগামেমনোন দেখলেন তাঁর কন্যা ক্রমশই এগিয়ে আসছে কুঞ্জপথ দিয়ে আহুতির বেদীর দিকে, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন

অন্য দিকে, চোখ ঢাকলেন তাঁর পোশাকে। তোমার কন্যা এগিয়ে এসে বললেন, "পিতা, আমি উপস্থিত, তোমার নির্দেশে আমি এসেছি। স্বেচ্ছায় আমি আমার এই শরীর গ্রীসকে দান করলাম। এবার আমায় নিয়ে চলো বধ্যভূমিতে। তোমাদের মঙ্গল হোক, তোমাদের জয় হোক, নির্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরে এসো। কোনো দৈত্য যেন আমাকে স্পর্শ না করে।

"আমি প্রস্তুত, আমি অকম্পিত।

নীরবে আমি আমার কণ্ঠ তুলে ধরছি।"

সবাই চমৎকৃত, নির্বাক। কুমারীর কী মহত্ত্ব, কী সাহস! তারপর এগিয়ে এল সৈন্যবাহিনীর ঘোষক— তালথ্‌বিয়োন। সে সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিল স্থির হয়ে দাঁড়াতে। চারদিকে নেমে এলো গভীর স্তব্ধতা। দৈবজ্ঞ কালখাস তাঁর পিধান থেকে উন্মুক্ত করলেন এক তরবারী, রাখলেন এক স্বর্ণখচিত ডালায়। কুমারীর মাথায় জড়ানো মালা। পেলেউসের পুত্র আখিল্লেস সেই ডালি নিয়ে দেবীর বেদী প্রদক্ষিণ করলেন, ছড়িয়ে দিলেন পবিত্র জল, তারপর তিনি বললেন,

"হে জেউস-দুহিতা, তুমি পশুদের জীবনে মৃত্যু আনো, তোমার আদেশে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের দল আবর্তন করে অন্ধকার রাত্রি; আমরা, গ্রীক সৈন্যবাহিনী এবং রাজা আগামেমনোন, উৎসর্গ করছি এই সুন্দরী কুমারীর কণ্ঠ-উৎসারিত পবিত্র রক্ত; তুমি আমাদের তরণীকে চালিত করো নিরাপদ সমুদ্রে, আমাদের শক্তি দাও, আমাদের অস্ত্র বিধ্বস্ত করুক ট্রয়ের প্রাচীর।"

পুরোহিত প্রার্থনা করলেন। ছুরি তুলে নিলেন হাতে, তাকিয়ে দেখে নিলেন কোথায় অস্ত্রাঘাত করতে হবে।

আমার বুক ভরে এল যন্ত্রণায়, নতশিরে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। প্রত্যেকেই শুনতে পেল ছুরিকাঘাতের শব্দ, কিন্তু কেউ কুমারীকে দেখতে পেল না, কোথায় সে গেল অদৃশ্য হয়ে। পুরোহিত চীৎকার করে উঠল। সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি উঠল সৈন্যদের শতকণ্ঠে। তারা দেখতে পেল দেবতা-প্রেরিত এক দিব্য মূর্তি। অবিশ্বাস্য,

অসম্ভব! তারা দেখল বেদীমূলে পড়ে রয়েছে একটি সুন্দর, বিশাল, যন্ত্রণা-কাতর হরিণ, তার রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। কল্পনা করো, কী আনন্দে কালখাস চেঁচিয়ে উঠলেন, বললেন,

"গ্রীক সৈন্যদলের নায়কেরা, ছাখো, দেবী আর্তেমিস কুমারীর পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন একটি পার্বত্য হরিণ, নারীর রক্তে তাঁর বেদী রঞ্জিত হতে দেননি। আনন্দে এই উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন, তিনি আশীর্বাদ করেছেন, আমাদের যাত্রা হবে বাধাহীন, সফল হবে ট্রয় অভিযান। নাবিকেরা বুক বেঁধে দাঁড়াও, ভাসাও নৌকা। আজই আউলিস উপসাগর থেকে নোঙর তুলে আমরা পাড়ি দেব আয়জেয়ান সমুদ্রে।"

নিহত হরিণটি যখন হেফাইস্তোসের পবিত্র আগুনে ভস্মীভূত হল, সৈন্যদের নির্বিঘ্ন পুনরাগমনের জন্য পুরোহিত কালোপযোগী প্রার্থনা উচ্চারণ করলেন।

রানী, আমি আগামেমনোনের কাছ থেকে আসছি। দেবতারা তাঁকে কী দিয়েছেন, গ্রীকদের জন্য তিনি কোন্ মৃত্যুহীন গৌরব অর্জন করেছেন সেই কথা তোমাকে বলার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমি দেখেছি, দেবতারা তোমার কন্যাকে গ্রহণ করেছেন। তোমার শোকের শেষ হোক, স্বামীর প্রতি তোমার দুর্জয় ক্রোধ অপসৃত হোক। দেবতাদের রীতিনীতি মানুষের কাছে দুর্জ্ঞেয়, যাদের প্রতি তাঁরা প্রীত, তারাই সুখী। একই দিনে তোমার কন্যার মৃত্যু, তোমার কন্যার পুনর্জীবন।

কোরাস॥ দূতের কথায় আমরা উল্লসিত।
তোমার কন্যা জীবিতা
দেবতারা তাঁকে নিয়ে গেছেন।

ক্লূতা॥ কোন্ সে দেবতা? কে তোকে নিয়ে গেল? কোন্ ভাষায় তোকে ডাকব? কি কথা বলব?
হয়তো আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই এরা এক মিথ্যা উপকথার সৃষ্টি করেছে।
কেমন করে জানব, এ কি সত্য, একি মিথ্যা!

কোরাস ॥ রাজা আগামেমনোন আসছেন !

[আগামেমনোনের প্রবেশ। সঙ্গে কয়েকজন অনুচর, পুরোহিত।]

আগামেমনোন ॥ যা ঘটেছে সব শুনেছ।
তোমার কন্যার কথা বলতে এলাম। আমরা সবাই
খুশী। সে এখন দেবতাদের আশ্রয়ে।
এখন তুমি ঘরে ফিরে যাও, শিশু পুত্র নিয়ে।

সৈন্যেরা প্রস্তুত। যেতে হবে।
বিদায়।
ট্রয় থেকে ফিরতে অনেক দেরি হবে।
কল্যাণ হোক।

কোরাস ॥ আত্রেয়ুসের পুত্র ! রাজা আগামেমনোন
তোমার ট্রয় যাত্রার পথ নির্বিঘ্ন হোক
তোমার জয় হোক
প্রার্থনা করি
সুখী মনে ট্রয় থেকে ফিরে এসো।

[সবাই চলে যায় একে একে। ক্লুতাইমনেস্ত্রার চোখে অবিশ্বাস ও ঘৃণা। সে ভ্রূক্ষেপ করে না আগামেমনোনের দিকে। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।]

যবনিকা

চরিত্র পরিচিতি

আইয়াস (Ajax) : দুজন গ্রীক বীরের নাম। একজন ওইলেউসের পুত্র, অন্যজন তেলামোনের সন্তান।

আউলিস (Aulis) : বিয়োতিয়া সমুদ্র-উপকূলের শহর।

আখিল্লেস (Achilles) : সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক বীর।

আরগিভ (Argive) : গ্রীকরা এই নামে পরিচিত ছিলেন। আর্গোস (Argos)-এর অধিবাসী। গ্রীসের অন্য নাম আর্গোস। যদিও আগামেমনোনের রাজ্যের নামও ছিল আর্গোস।

আর্তেমিস (Artemis) : চিরকুমারী দেবী। কৌমার্য, পশু, শিশুর জন্ম ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী।

আরথৌসা (Arethousa) : খালকিসের কাছাকাছি এক ঝর্নার নাম।

আত্রেয়ুস (Atreus) : আগামেমনোনের পিতা।

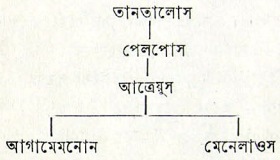

ইদা (Ida) : ট্রয়ের নিকটবর্তী পর্বত। এখানে প্যারিস পালিত হয়েছিলেন।

এউমেলোস (Eumelos) : আদ্‌মেতোসের পুত্র। সবচেয়ে রূপবান গ্রীক।

এউরিপোস (Euripos) : বিয়োতিয়ার অন্তর্গত আউলিস এবং এউবোইয়া দ্বীপের অন্তর্গত খালকিস নগরীর মধ্যবর্তী যোজক।

কুপ্রিস (Cypris) : আফ্রোদিতের অন্য নাম। আফ্রোদিতে ছিলেন কুপ্রুস (Cyprus)-এর দেবী।

থেইরোন (Cheiron) : পেলিয়োন পর্বত নিবাসী জ্ঞানী। ইনি কেনতাউর-দের একজন। কেনতাউর (Centaur)-রা অর্ধ-নর অর্ধ-অশ্ব।

গানিমেদে (Ganymede) : ট্রয়ের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দারদানোসের সন্তান। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে জেউস এক ঈগলের রূপ ধরে তাঁকে স্বর্গে এনেছিলেন। তাঁর কাজ ছিল দেবসভায় মদ্য পরিবেশন।

তানতালোস (Tantalos) : একজন তানতালোস আত্রেয়ুস বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আর-একজন থুয়েসতেস (Thyestes)-এর পুত্র এবং ক্লুতায়মনেস্ত্রার প্রথম স্বামী। তাঁকে আগামেমনোন হত্যা করেছিলেন।

থেস্তিয়োস (Thestios) : লেদার পিতা।

থেস্তিয়োস
|
লেদা + তুনদারেয়োস (Tyndareos)
|
ফোইবে | ক্লুতায়মনেস্ত্রা | হেলেন

থেতিস (Thetis) : সাগর অপ্সরা। আখিল্লেসের জননী।

দারদানোস (Dardonos) : দ্র: গানিমেদে

দিয়োস কৌরী (Dios kouri) : জেউসের পুত্রদ্বয়। জেউস ও লেদার সন্তান। অন্য নাম কাস্তোর (Kastor) ও পোলুদেনকেস (Polydenkes) বা Castor ও Pollax।

নেরেইদ (Nereids) : সমুদ্রদেবতা নেরেউস (Nereus)-এর কন্যাগণ। থেতিসও একজন নেরেইদ।

পালামেদেস (Palamedes) : কিম্বদন্তী ইনি Checkers খেলার উদ্‌ভাবক।

মুরমিদোন (Myrmidon) : পেলেউস এবং আখিল্লেসের প্রজাবৃন্দ।

সিসুফোস (Sisyphos) : কোরিন্থের রাজা, অত্যন্ত ধূর্ত ও জুয়াচোর প্রকৃতির। ওদুসসেউস (Odysseus)-কে লোকে তার ধূর্ততার জন্য "সিসুফোসের পুত্র" আখ্যা দিয়েছিল। ওদুসসেউসের পিতার নাম অবশ্য লায়ের্তেস (Laertes)।

হেফাইস্তোস (Hephaistos) : আগুন ও ধাতু বিদ্যার দেবতা।

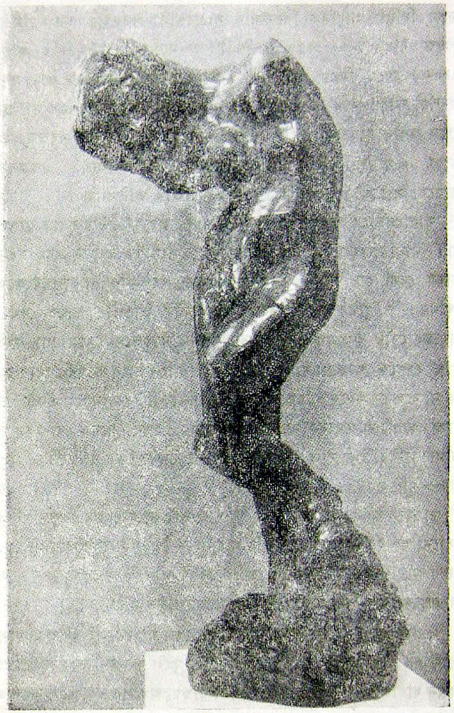

রদ্যাঁর ভাস্কর্য

ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মর্ডান আর্টের সৌজন্যে

রদাঁর প্রদর্শনী

(বিভাবের প্রতিনিধি সবিতা সরকারের বিশেষ প্রতিবেদন)

নতুন দিল্লির আধুনিক শিল্পকলার সংগ্রহশালা গ্যালারি অব মডার্ন আর্টে অগুস্ত রদাঁর (১৮৪০-১৯১৭) প্রদর্শনী (২৯ নভেম্বর, ১৯৮২ - ১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৩) দেখে ফিরে আসছি। কোনো প্রদর্শনী কক্ষে এত বড়ো ভাস্কর্যের প্রদর্শনী আগে দেখি নি। এমন একটা প্রদর্শনী কেমনভাবে এল তা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। বিশাল আর ছোটো কাজ মিলিয়ে সবসুদ্ধু ১০৭টা ভাস্কর্য এসেছিল। তার সঙ্গে এসেছিল ৭০টা রেখাচিত্র। একজন মহান ভাস্করের সারাজীবনের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিব্যক্তি।

সাধারণভাবে আমাদের ভাস্কর্য দেখার অভ্যাস তৈরি হবার সুযোগ হয় না। নানা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে যাদুঘরে সংগৃহীত প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভাস্কর্য দেখা হয়ে যায়। কোনারক, খাজুরাহো মন্দিরের ভাস্কর্য অনেকেই দেখেন। আধুনিক ভাস্কর্য বলতে সমকালীন ভারতীয় ভাস্কর্য দেখা যায় সামান্যই যৌথ বা একক প্রদর্শনীতে। শান্তিনিকেতনে গেলে রামকিংকরের কাজ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ভাস্কর্য দেখার সুযোগ হয় না বলে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা তৈরি হয় না। একটা ভাসা-ভাসা অস্পষ্টতা থেকেই যায়। বরং ছবির প্রদর্শনী অনেক বেশি হয় বলেই আমরা ছবির বিষয় বুঝি অনেক বেশি। রসিক ব্যক্তির বাড়িতে ছবিই দেখা যায়— মূর্তি নয়।

তা ছাড়া কলকাতায় ইদানীং নগর সাজাবার নামে যে সব কিম্ভূত মূর্তিগুলো বসানো শুরু হয়েছে, সেগুলো আর যাই হোক ভাস্কর্য নামের অযোগ্য এবং এ বিষয় আমাদের জ্ঞান যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর তারই প্রমাণ। তবে একজন বলেছেন যে এগুলো কলকাতার জঞ্জালের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় চমৎকার!

কল্পনা করুন হঠাৎ এমন তৈরি চোখের সামনে যদি রদাঁর রচনাসম্ভার থেকে একটা সুনির্বাচিত সংকলন গ্রন্থনা করে তুলে ধরা হয়, তা হলে প্রতিক্রিয়া কেমন ধারার হতে পারে! তেলেভাজা খাওয়া অম্বলের রুগীকে যদি পোলাউ-মাংসের ভোজে নেমন্তন্ন করতে হয়, তাহলে বদ হজম হবারই সম্ভাবনা। চোঁয়া ঢেকুর ওঠার কথা। কিন্তু রদাঁর রান্না এমনই ভালো এবং এতই সুস্বাদু যে পরিপাকক্রিয়ায় কোনোরকম অসুবিধা হয় না।

প্রদর্শনী দেখার পর এই প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে রদাঁর কাজ কি আধুনিক? সমকালে ভাস্কর্যের নামে যে যথেচ্ছাচার তার কোনো উদাহরণ তো ওঁর মধ্যে দেখি নি। ইঁট, কাঠ, দড়ি, দোমড়ানো গাড়ি, কমোড বসিয়ে তাকে ভাস্কর্য বলার চেষ্টা কই দেখলাম না। বরং ক্ল্যাসিকাল আর রোমান্টিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেবার পরই রদাঁর স্বাতন্ত্র্য দেখা গেছে।

রদাঁর ভাস্কর্যের মধ্যে পুরাণ-নির্ভর কাজের সংখ্যা যে নেই তা নয়, কিন্তু প্রধানত মানবদেহের বিষয় তিনি অনুরাগী। এই দেহগুলো শারীরবিদ্যা অনুসরণ করেই তিনি সৃষ্টি করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে। কারণ শেষ পর্যন্ত নিছক ডাক্তারী কাটাছেঁড়ার কৌতূহল সৃষ্টির জন্য তিনি কাজ করেন নি। সব সময় দেহের মধ্যে একটা ছন্দ এবং গতি এনেছেন। প্রতিটি কাজ যেন গতির ছন্দে কেঁপে উঠেছে। একটা প্রাণচাঞ্চল্যের লক্ষণ এনেছেন। দেহের চলা বা বাঁকা বা ঝোঁকার বা পড়ে যাবার ভঙ্গি। আমাদের দেহও এইভাবে নড়াচড়া করে প্রতিমুহূর্তে, খেলাধুলা দেখার সময়টা বাদ দিলে, এ বিষয় আমরা ভাবি না। দেহের সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন একটা বসা বা শোয়া জড়পিণ্ডের কথা ভাবি। কিন্তু প্রাণের প্রকাশ তো খেলা বা চলার ছন্দে। এই-সব ভঙ্গির মধ্যে যে নাটকীয় মুহূর্ত আছে রদাঁ যেন স্বপ্নলোকে ধরেছেন। এই-সব ভঙ্গির মধ্যে দেহের খাঁজে যে আলোছায়ার খেলা তৈরি হয়, গ্রন্থিতে, চামড়ায়— শরীরের সর্বত্র যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাই ধরেছেন। আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, অতিভঙ্গ, দেহের ভঙ্গিতে এভাবে তাঁর কাজও দেখা যায়। কিন্তু তিনি যে সেভাবে ভাবেন নি সেটা স্পষ্ট। স্থিতি বা যতির মধ্যে গতির খণ্ডিত একটা অংশ ধরে তিনি নাটক তৈরি করেছেন এক জায়গায় নাড়াচাড়া খেলেই তার কম্পন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত অঙ্গসঞ্চালনের ভেতর দিয়ে একটা চরম সুন্দর মুহূর্তের জন্ম হচ্ছে। রদাঁ যেন সেইটা দেখাতে চেয়েছেন। ফলে তিনি অতিশয়োক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের বিশ্বাসের সঙ্গে খেলতে খেলতে অসম্ভব একটা জায়গায় এনে থমকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা মুগ্ধ দর্শক। বস্তুপুঞ্জ আর আয়তনের ছন্দিত সম্পর্ক নিয়ে অসামান্য কাজ।

রদাঁ নটরাজ মূর্তির প্রেমিক ছিলেন। কিন্তু নটরাজের কল্পনা দৈবী এক মহাকালের বিষয়। রদাঁর পাত্রপাত্রীরা অধিকাংশই মানব-মানবী। সময়ের ভেতর থেকে হঠাৎ টুক করে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেছেন যেখানে সময়

অনুপ্রবেশ করতে পারে না। মানবদেহের মধ্যে যে বিগলিত সৌন্দর্যের সম্ভাবনা সেটা দেখিয়েছেন। আর এর চরম প্রকাশ যেন রতিক্রিয়ার পূর্বে শৃঙ্গারের সময় নিয়ে মূর্তিগুলিতে ধরা দিয়েছে। অথচ এমন অমল এবং স্বাভাবিক যে অশ্লীল বলার জো নেই।

রদাঁর প্রথম দিকের কাজের প্রসঙ্গে মাইকেলেঞ্জেলোর কথা তোলা যেতে পারে। এই মহান শিল্পীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি প্রচলিত প্রথাসর্বস্ব ধারার বিরোধিতা করেন। ভাস্কর্যের রচনাসৌকর্য, বস্তুপুঞ্জের কম্পিত খেলা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর সহজাত বোধ ছিল। কিন্তু ইটালিতে মাইকেলেঞ্জেলোর কাজ দেখার পরই তার উত্তরণ ঘটল, এখানে একটু খুঁটিয়ে তারিখ মিলিয়ে আমার তাই মনে হয়েছে। এরপর থেকে ক্রমে রদাঁর কাজে উত্তরণ ঘটল। ঐতিহ্যকে বুঝে নিয়ে যেন তিনি সেই নদী পেরিয়ে গেলেন।

রদাঁর কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে স্পষ্ট ভাগ করা যায়। যেমন প্রথমেই ধরা যায় তাঁর প্রতিকৃতির কথা। সংখ্যায় বহু, তার মধ্যে অনেক বিখ্যাত কাজই দিল্লিতে প্রদর্শিত হয়। প্রথমত যাঁর প্রতিকৃতি তিনি করছেন তাঁর মুখের আদলের সঙ্গে সাদৃশ্য, তারপর ত্বকের ভাঁজগুলোর মধ্যে দিয়ে মানুষটির চরিত্র ধরার চেষ্টা। মডেলিং এবং শারীরবিদ্যাগত ব্যাপারে এমনই দক্ষতা এবং জ্ঞান ছিল যে তিনি মূর্তিতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। কলকাতায় বেশির ভাগ সরকারি মূর্তিগুলোকে মৃত বলে নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়। একমাত্র দেবীপ্রসাদ, রামকিংকর, শর্বরী রায়চৌধুরী এবং বিপিন গোস্বামীর করা প্রতিমূর্তিতে এমন সজীবতা দেখেছি। রদাঁর আবক্ষ মূর্তিতে যেন প্রাণবায়ু আছে। অথচ একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ক্লাসিক গ্রেসে-র সঙ্গে রোমান্টিক স্বপ্নমদিরতা যোগ করেছেন। ত্বকের মসৃণতার মধ্যে ঝিলিক খেলিয়েছেন আলোছায়ার। মানুষের মুখের সঙ্গে মেলালে ওঁর অভিব্যক্তির যে স্বাধীনতা গ্রহণ করা, সেটা চোখে পড়ে প্রথমেই। বরং হুগো বা বার্নার্ড শ'-য়ের প্রতিমূর্তিতে তিনি সাবধানী, কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের "ম্যান উইথ দ্য ব্রোকেন নোজ" বা বালজাকের মূর্তির দাঁড়ানো নগ্ন ভঙ্গি, বা মুখ নিয়ে অনুশীলন দেখলেই বোঝা যায় যে সৃজনশীলতার কোন্ পর্যায়ের শিল্পী ছিলেন তিনি। মোটাসোটা মেদবহুল অহংকারী বালজাক, সিংহের মতো মাথা নিয়ে যখন তাকান, তখন বোঝা যায় সৌন্দর্যের ব্যবহারিক সংজ্ঞাকে বাতিল করে রদাঁ যেন অভিব্যক্তির স্বাধীনতাকে বেছে নিয়েছেন। ক্ল্যাসিকাল রূপবেদ,

নিও-ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গিসর্বস্বতা, রোমান্টিক আবেগপ্রাবল্য থেকে অন্য একটা স্তরে চলে গেছেন। বালজাকের মূর্তিতে তিনি যেন আমাদের ভাস্কর্যের সুকুমারবোধগুলিকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়েছেন।

তেমনি তাঁর "বার্গার অব ক্যালে"-র কাজটি। শতবর্ষের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের রাজার কাছে ক্যালের নগরের গণ্যমান্য মানুষগুলি নিজেদের প্রাণের বিনিময়, নগর এবং নাগরিকদের প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল। বীরত্বের চেয়ে বধ্যভূমিতে বলির পশুর মতো অগ্রসর হবার ট্র্যাজিডিটা ধরেছেন। বাস্তবে মানুষ যে জীবনকে ভালোবাসে সেটা স্পষ্ট। ছ'জন যে আলাদা, পা ফেলেছেন যেন কদম না মিলিয়ে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে গেলে মানুষের ভেতরে যে আতঙ্ক এবং নৈরাশ্য হয় তারই প্রতিমূর্তি এঁরা। বালজাকের মতো এক্ষেত্রেও যাঁরা মজুরী দিয়ে কাজটি করিয়েছিলেন, তাঁদের রদাঁর মূর্তি পছন্দ হয় নি। বীরত্বের নাটক চেয়েছিলেন তাঁরা, বিয়োগান্ত পরিস্থিতি নয়।

তেমনি তাঁর বড়ো কাজ নরকের দ্বার। প্রত্যায়িত নকল। তবে দরজার মূর্তিগুলি খোলা এসেছে। আলাদা আলাদা। ওপরের তিনটে ছায়ামূর্তি, দার্শনিক (দ্য থিংকার), খণ্ড খণ্ড নানা অংশ। মূল কাজটির ব্লো আপ ফোটো আছে দেওয়ালে টানানো। একটি অসমাপ্ত সিম্ফনির মতো করে মানুষের মাঝে যে সুরাসুর তার চাক্ষুষ রূপ। দান্তের নরক থেকে রাবোঁর নরক যেন প্রবল হয়েছে। যেন বিশাল এক মহাকাব্য— যন্ত্রণা আর বিচ্ছিন্নতার। বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব। সভ্যতার সংকটের ভয়াবহ চেহারা।

তেমনি আবার আছে প্রেমের দেহজ বর্ণনা। রদাঁর সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের কামশাস্ত্রের ভীষণ মিল। বেদনার চেয়ে আবেগের ঘন মুহূর্তে তিনি চরম রূপকার। এ-সব ক্ষেত্রে আমাদের রদাঁকে আপন মনে হয়। ভারতীয়। তেমনি নৃত্যের নানা পোজ ধরার মধ্যে দেহের গতিশীল চলনকে ভারতীয় ভাস্কর্যের মতোই রূপায়িত করায় তাঁর প্রবণতা লক্ষ্য করলাম। আর ছিল সত্তরটি রঙিন স্কেচ। রদাঁ যে রেখাচিত্রে যাদুর খেলা দেখাতে পারেন তা আমার অন্তত জানা ছিল না। শুধু সীমারেখা আর রঙিন ওয়াশ দিয়ে নারীদেহের নানা ভঙ্গি— সম্ভব অসম্ভব— ধরেছেন কাব্যিক ভাবে।

পরিশেষে তাঁর বিরাট চুম্বন মূর্তিতে নরনারীর বসে থাকার মধ্যে যে অনুরাগ সঞ্চারিত করেছেন তার বিষয়ে বলতে হয়। যে কোনো দৃষ্টিকোণ

থেকে তা চোখকে উদ্বেলিত করে। আঙুলের বদলে চোখ দিয়ে আদর করতে করতে ওঁর মূর্তি দেখেছি। সৃজনশীল কী আগুন থাকলে এমন মূর্তি সৃষ্টি হয় তা কল্পনা করতে পারি। সে ক্ষমতা সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ করলেই কেবল সম্ভব। রদাঁ কত বড়ো সিদ্ধপুরুষ ছিলেন তাঁর এই মূর্তিগুলি না দেখে, ফোটো দেখলে কল্পনা করতে পারতাম না। ন্যাশনাল গ্যালারির অধিকর্তা শ্রীলছমিপ্রসাদ শ্রীহারে এবং তাঁর সহকর্মীদের কাছে কী ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না।

আলোচনা

'আলো, আরো আলো'

শর্মিলা বসু

অরবিন্দ-ভবনের অন্ধকার মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় পা-ব্যথা হবার অবস্থা। স্টেজে তখনো চলেছে রচনা-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ মাইকে শোনা গেল এবার শুরু হবে 'আলো, আরো আলো' রূপকালেখ্য। কোনোমতে একটা চেয়ার জোগাড় করা গেল—বসতেও পেয়ে গেলাম মোটামুটি ভালোই একটা জায়গায়। তার পরের ঘণ্টাখানেকের অভিজ্ঞতা?—এককথায় বলতে গেলে বেছে নেব একটাই শব্দ—'ছন্দোময়'।

অরবিন্দ-ভবনের সাংস্কৃতিক দপ্তরের পরিচালনায় গ্যেটের দেড়শতম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে সেদিন গ্যেটের ফাউস্ট এবং অন্যান্য রচনার ভিত্তিতে নির্মিত 'আলো, আরো আলো'র মঞ্চায়নের ব্যবস্থা হয়েছিল। জার্মানীর মনীষী গ্যেটের নাম কারো কাছেই অশ্রুতপূর্ব নয়। গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২) পরিচয় দিতে গিয়ে সাহিত্যিক-পরিচায়িকাতে বলা হয়—'German poet, dramatist, critic, novelist and scientist.'[১] অনুষ্ঠানের নান্দীপর্বে গ্যেটের পরিচয় দেওয়া হয় এমনভাবে—'গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির মঞ্জরিত পরিণতির নাম গ্যোয়েটে, যার আবেদন হতে পারে সর্ব-ইয়োরোপীয় চেতনা। য়োহান হ্বোল্‌ফগাং ফন গ্যোয়েটে সম্ভবত পশ্চিম সভ্যতার শেষ প্রাচীন এবং প্রথম আধুনিক কবি।'

প্রথমেই গ্যেটে এবং অরবিন্দের আন্তর-সংযোগের কথা নাতিবিস্তৃতিতে জ্ঞাপিত হয়। গ্যেটে সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ একটি কবিতা লেখেন—বাংলায় এটির অনুবাদ করেন শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। এটি সেদিন আবৃত্তি করে শোনানো হয়।

গৌরচন্দ্রিকার পর মূল পালায় প্রবেশ—গ্যেটে সম্পর্কে একটি অভিভাষণ দিয়ে। এই ভাষণটিতেই বলা হয় এই রূপকালেখ্যটি—'আলো, আরো আলো'

—গ্যেটের মর্মবাণীর উপর রচিত। গ্যেটে তাঁর জীবনের প্রায় ষাট বছর অতিবাহিত করেন ফাউস্ট রচনায়। আবার সেই একই সাহিত্যিক-সহায়িকার দ্বারস্থ হওয়া যাক ফাউস্ট সম্পর্কে একটু ভাবনা প্রসঙ্গে—"The theme at the heart of Goethe's dramatic poem *Faust* is an old one. Man's desire to the eternal questions of the meaning of life and the universe is not peculiar to the modern period or to the great German poet. However, the breadth of vision and the grandeur of poetic expression as Goethe concerns himself with this universal problem are peculiar to him and are, in the main, the measure of his greatness.'[২]

ফাউস্টের কাহিনী দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে— গ্যেটের রচনার প্রায় তিনশ বছর আগে থেকে এ কাহিনী প্রচলিত। ফাউস্টের আধুনিক কাহিনীর নায়ক যিনি— তাঁর নাম ডাক্তার জোহান বা জর্জ ফাউস্ট— ইনি ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। ষোড়শ শতকে ইংল্যাণ্ডে মার্লোর 'দ্য ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ডক্টর ফাউস্টাস' (১৫৮৮) এই ফাউস্টের কাহিনী নিয়েই লেখা। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে গ্যেটে 'ফাউস্ট' রচনা শুরু করেন। ১৭৭৩-৭৫-এ তিনি 'ফাউস্টে'র অংশবিশেষ লেখেন। পরে তাঁর বন্ধু শিলারের প্রেরণায় তিনি আবার 'ফাউস্ট' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ফাউস্ট গ্রেচেন (মার্গারেট) মেফিস্টোফিলিসের কাহিনীর মধ্যে যে অন্তরজিজ্ঞাসা বা আত্মজিজ্ঞাসা— তাকে মূর্ত করে তোলাই প্রয়োজনাটির মূল কেন্দ্রীভবন। বৃহত্তর অর্থে এ জিজ্ঞাসা এক রূপান্তরিত বিশ্বমানব-জিজ্ঞাসাও।

গ্যেটেকে অন্যতম অগ্রণী ভারতপথিক বলে মেনে নেওয়া হয় প্রয়োজনাটির নান্দীপাঠে। উইলিয়ম জোন্সের শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে জার্মান ভাষায় তার তর্জমা করেন গেয়র্গ ফর্স্টর। হার্ডার সেই তর্জমা-পাঠের আনন্দকে ছড়িয়ে দিলেন অজস্র পত্রধারায়। গ্যেটে তার মধ্যেই আবিষ্কার করলেন— 'প্রকৃতির ঋতুরঙ্গ, জীবনের লীলা ধ্যানের মহিমা রচনা করে স্রষ্টা এখানে সৃষ্টির ঊর্ধ্বে বিরাজমান।'

১. *The Reader's companion to World Literature—Hornstein —Percy Brown, p. 186*

২. *ঐ p. 163 - 64*

রবীন্দ্রনাথ এই গ্যেটেকেই আবিষ্কার করেছিলেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ' লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— দান্তে ও পেত্রার্কের প্রেম, প্রেমের আদর্শ— আর গ্যেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ।

গ্যেটের অপার্থিব নারীত্বের স্তোত্রর কথা তা বলে রবীন্দ্রনাথ ভোলেন নি। তাই গ্যেটে যাকে বলেছেন eternal woman, রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন উর্বশী— একথা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতের গ্যেটে' আখ্যায় বৃত হয়েছেন আলবার্ট শোয়াইৎজারের দ্বারা। গ্যেটের জীবনী রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে ভাবিত করে— গ্যেটের মতোই সত্য আর কবিতার ছন্দায়িত হিল্লোলে তিনি জীবনের অর্থ অন্বেষণ করেছেন। 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে বলেছেন গ্যেটের জীবনের কথা। বলেছেন—'আমি আলো ও আকাশ এত ভালবাসি। গ্যেটে মরবার সময় বলেছিলেন— more light— আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি more light and more space'

ভারতপথিক গ্যেটে আর ইউরোপবাসী রবীন্দ্রনাথ— সমস্ত অপূর্ণতার মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার দিকে উত্তরণ। সমস্ত রচনাই তাঁদের কাছে বিরাট স্বীকারোক্তির একটি ভগ্নাংশ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটের এই মেলবন্ধনের পর শুরু হল 'প্রমেথিউসে'র একটি ফিল্মভাষ্য। স্বর্গ থেকে আগুন আনল পৃথিবীতে প্রমেথিউস। অথচ সে এরই জন্য দেবতাদের দ্বারা হলো নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত। এই কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এসকাইলাস, শেলি। গ্যেটের চিরন্তন অথচ আধুনিক কবিতা 'প্রমেথিউস'। এরই ফিল্মীরূপ দেখানো হল। নামপত্রে দেখা গেল অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দুর্গাশঙ্কর ঘোষের নাম। ছবিটিতে অজস্র রঙের খেলা— বিশেষত লাল রঙের ব্যবহার সুন্দর। তবে কোথাও কোথাও একটু বেশি চড়া লেগেছে। আলোকময় সরণির একটি দৃশ্য রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিকে মনে পড়ায়। শব্দব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গোটা ফিল্মটির সঙ্গে যে ধারাবাহিক কাব্যভাষ্য তার কিছুই প্রায় শোনা যায় নি।

এরপর 'ফাউস্ট' আবৃত্তি ও অভিনয়। ফাউস্টের অনুবাদ কানের ভেতর দিয়ে সেদিন যেটুকু মর্মে প্রবেশ করছিল তাকে আক্ষরিক এবং তাৎপর্যগত-

ভাবে ভাষার ছন্দোভঙ্গটুকুকে 'অলৌকিক' বলতে ইচ্ছে করছিল। অনায়াসেই ধ্বনিত হয় এরকম লাইন—

অনবসর আনন্দের ভাষা
তুমিই শুধু, তুমিই—ভালোবাসা॥

বিশ্বপ্রেমিকতা, অনিকেত— এ-জাতীয় ধ্রুপদী শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করবার মতো। বিশেষত 'আক্ষেপানুরাগ' শব্দটির ব্যবহারের তো কোনো তুলনা নেই। শব্দব্যবহারের তৎসমানুরক্তি কোনো কোনো শ্রোতাকে বিরক্ত করলেও করতে পারে। তাঁদের কাছে তাই আগেভাগেই জানিয়ে রাখি এমন ধ্রুপদীয়ানা ছাড়া কি ফাউস্টের আবেদনকে সঞ্চারিত করা যেত এত সলিল স্বাচ্ছন্দ্যে? 'ভুবনেশ্বর', 'নবজীবনের প্রান্তে' প্রভৃতি ব্যবহারে গোটের অনুবাদে একটি রবীন্দ্র-অনুষঙ্গকে খুব সহজেই পাওয়া যায়। ছন্দের এবং পদান্তমিলের অভিনবত্বও বড়ো ভালো লাগে—শ্রুতিকে বড়ো তৃপ্ত করে। যেমন—

আহারে আহা তার নিশীথ দিনমান
দাঁড়িয়ে জানালার ধারে।
বৃথাই চেয়ে থাকে মেয়েরা লীয়মান
নগরপ্রাচীরের পারে।

আবার 'পিছু-নিচু'র মতো সহজতম মিলের বিন্যাসও চমৎকার—

ঐ যে লোকটা নিয়েছে তোমার পিছু
ওকে দেখলেই মনে হয় খুব নিচু···

গ্রেচেনের একটি সংলাপ তো প্রায় ধ্রুবপদের মতো বারবার মাথায় ফিরে ফিরে আসে—

শান্তি কোথা, হৃদয় জুড়ে শুধু
প্রত্যাশার ক্ষত,
শান্তি কোথা? হৃদয় নিরবধি
বিরহ শাশ্বত।

পণ্ডিতি তর্ক-যুক্তির গাম্ভীর্যে না ঢুকেও যদি খুব একটিমাত্র উত্তরে অনুবাদটি কেমন লেগেছে তা বলতে হয়, তা হলে একটি শব্দই বোধ হয় যথেষ্ট—'সুন্দর'। শেষের কোরাসটি বহুক্ষণ মনে জেগে থাকে—

যা কিছু ক্ষণিক, অচিরস্থায়ী সে তো
একটি রূপকে আভাসিত রয়ে যায়;

যা-কিছু অনতিসাধ্য, অনর্জিত
রূপ নেয় এক জীবন্ত ঘটনায়;
অবর্ণনীয় যা-কিছু ভাষার পারে
প্রাণ পেয়ে ছাখো জেগে আছে এইখানে,···

এবার বলি, পাঠ ও অভিনয়ের কথা। মার্গারেট বা গ্রেচেনের ভূমিকায় সুদেষ্ণা রায় মানানসই। তাঁর কণ্ঠও সুন্দর, উচ্চারণও পরিষ্কার। তবে 'শ'-এর ওপর অনাবশ্যক জোর কোথাও কোথাও কানে লাগে। সুদেষ্ণা যখন নিজে অভিনয় করেন না তখন কখনো কখনো অভিব্যক্তিহীন হয়ে পড়েন—সহ-অভিনেতার টেনশনকে তিনি নিজের অভিব্যক্তিতে জাগিয়ে রাখতে পারেন না সব সময়ে। তবে তাঁকে মানিয়েছিল চমৎকার। অনিমেষ গঙ্গোপাধ্যায় আরো অনেক ভালো করবেন যদি অভিনয়ে অতি-নাটকীয়তাকে বাদ দিতে পারেন। তাঁর অভিনয় মাঝে মাঝে এক খ্যাতিমান অভিনেতার ভঙ্গিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনবদ্য পাঠ ও অভিনয় শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের। ফাউস্টের আর্তি তাঁর মধ্যে সপ্রাণ, অনায়াস।

চিত্ত সরকারের আলোকসম্পাত ভালো; আবহসংগীতও মন্দ নয়। তবে কোথাও কোথাও সুর একটু বেশি চড়া লেগেছে। মেফিস্টোর আসার সঙ্গে সঙ্গে যে কান্নার শব্দের মতো সুর শোনা যায় তা সম্পূর্ণভাবে গোটা পরিবেশের সঙ্গে মিশে যায়। সাজসজ্জাও সুন্দর ও যথাযথ।

অঙ্গনমঞ্চটির গাছের তলায় ঝুপসি পরিবেশটি সেদিন এক মনোরম নিসর্গের মতো কাজ করেছে। তবে পাশের রাস্তা থেকে মিনিবাস বা স্কুটারের শব্দ সত্যিই অস্বস্তিকর।

কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

দুই পা তিন পা হাঁটলেই দোকান। দোকানে সাজানো থরে থরে নানাবর্ণ নষ্ট ও নিম্নমানের সিগারেট। নেশা বলে কথা, না হলে ধূমপান এখন এক বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ যখন কারো দেওয়া একটা ভালো সিগারেট ধরিয়ে টান দেওয়া যায়— তার যা আরাম, কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতা পড়ে প্রায় সেই রকম আরাম।

কবিতাগুলি অধিকাংশ ছোটো। দেখতে সাধারণ। বাহুবলে উত্তীর্ণ হওয়ার ঘাম চকচকে করে না ওদের শরীরে। ভঙ্গি যতটা না পদ্যের, গদ্যের তার চেয়ে বেশি, স্বগতোক্তি বা স্বীকারোক্তিজ্ঞাপক গদ্য, কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। এক টুকরো সংবাদ, ভেঙে ভেঙে কাচের চুড়ির টুকরোর মতো সাজানো লাইন— দীর্ঘ নয়, দীর্ঘাকার কবিতা, যা পড়তে আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি, এই-সব থেকে কালীকৃষ্ণ গুহ-র কবিতা কিন্তু অনেক তফাতে। তাই জনপ্রিয়তা থেকেও তফাতে।

অথচ কী পরিচ্ছন্ন। কী নিখুঁত অর্থাৎ বাহুল্যবর্জিত। আরম্ভের আগে আরম্ভ নেই, শেষের পরেও নেই দু-এক পঙ্‌ক্তির সমাপ্তি। যতটুকু না হলে নয় ততটুকু। প্রায় কৃপণের মতো শব্দের ব্যবহার। এবং যেখানকার শব্দ ঠিক সেখানে। যে বিশেষণটি ঠিকঠাক বাজে সেই বিশেষণটিই। যেমন এই গুচ্ছে "চলে যাচ্ছি" কবিতায়— নম্র পেনসিল, শান্ত ঝুড়ি, জটিল দেরাজ এবং ঠাণ্ডা আলমারি। আর বিশেষণহীন অন্যান্য পড়ে-থাকা জিনিসপত্রের মধ্যে অভিধান, প্যাড, টেবিল ল্যাম্পের ছোটো ছায়া। ছোটো উচ্চাশাহীন ছায়া।

বলতে চাইছি, এই ভদ্রলোক কবিতা লেখার প্রথম শর্তটি পালন করছেন। জোর দিয়ে বলছি এই কারণে যে এখন দক্ষিণ করাঙ্গুলিমেয় কয়েকজন ছাড়া এই প্রথম শর্তটিই দেখছি আর-কেউ মানতে অনিচ্ছুক। একটা লেখা পড়ে

মনে হল কম্পিটেন্ট, বাঃ। আজকাল এইটুকুই এক বিশাল প্রাপ্তি। হট্টগোলের ধুলো সর্বত্র। কে কবি, কে কবি নয়, বুঝতে হিমসিম খেতে হয় কারণ মুদ্রিত আকারে যে-সব রচনা অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে, কখনো সচিত্র, তাদের অধিকাংশ অজীর্ণ উদ্‌গার— এই অপ্রিয় সত্য কথা বলে দেবার লোক নেই। উপরন্তু, গলার জোরে, শরীরের ওজনে যিনি মঞ্চ দাপাতে পারেন, তিনিই মোহর কুড়োচ্ছেন। এ বড়ো সুখের সময় নয়।

অনুভূতিপ্রবণ মানুষ এই পরিবেশে স্বভাবতই কুণ্ঠিত। কালীকৃষ্ণও ব্যতিক্রম নন। কবিতা লিখছেন দীর্ঘকাল ধরে, বয়সও হয়তো চল্লিশ পার হতে চলল, অথচ একটিও উল্লেখ করার মতো কাব্যগ্রন্থ নেই। উচ্চাশায় তিনি কালো দাগ দেখতে পান। অন্ধকার হয়ে এলে তৃণ ও বৃক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে —কোন্‌দিকে যাবেন ঠিক বুঝতে পারেন না।

মাঝে মাঝে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের নাম স্মরণ করিয়ে দেয় বটে, তবু কালীকৃষ্ণের কবিতা প্রণবেন্দুর অনুসরণ নয়। কাঁটাকণ্টকযুক্ত লাইন, নরম, বিচলিত, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত— কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মমগ্ন নয়। তার ওপর মেধার আলো পড়েছে। কবির ছদ্মবেশে একজন চশমাপরা সমালোচককেও আমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাই। কবিতা ও শিল্পকলা থেকে যে পলাতক, তাকে ঠাট্টা করছেন। যেমন "অন্ধকার বাড়ি : কিছু স্বগতোক্তি" কবিতায়—।

কেন, "দিদিমণি" কবিতাটিতেও অন্যভাবে, যেখানে তিনি হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন জলপ্রপাতের উৎস ঠিক কোন্‌দিকে। "জল কিন্তু বস্তুত ছিলো না। ছিল জলের সন্দেহ ঘিরে পাথর ও গাছপালা, মলিন পিকনিক।" 'সন্দেহ' ও 'মলিন' শব্দদুটি অবশ্যই আবেগতাড়িত হয়ে আসে নি, এসেছে কবির নিজস্ব নির্বাচনে।

কেউ কেউ নালিশ করেন কালীকৃষ্ণ গুহ-র কণ্ঠস্বর অত্যধিক আর্ত ও নৈরাশ্যময়। 'জীবনের মধ্যে কোনো রহস্যময়তা আছে, বলে দাও।' 'ভিক্ষুকের মতো তাকে ভালোবাসি'— এই-সব পঙক্তি প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হয়। এই গুচ্ছে "চলে যাচ্ছি" কবিতাটিও এই জাতের। আমার মতে, আর্ত, নৈরাশ্যময় নয়, যৌন-কাতরও নয়, এগুলি জীবন সম্পর্কে ইলিউশনমুক্ত একজন বুদ্ধিমান আধুনিক মানুষের মনের প্রতিবিম্ব। চলে যাচ্ছেন, তিনি নিশ্চেতনা থেকে সব-কিছু দেখে নিয়ে— তবে চলে যাচ্ছেন। জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হওয়া হয়তো শিল্পীর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়, তাতে সৃষ্টিকাজ

ব্যাহত হতে পারে, সামাজিক মানুষ হিসেবে কবিকে ক্ষতিস্বীকার করতে হতে পারে, কিন্তু হায়, কবিরা কবে সৎপরামর্শে কর্ণপাত করেছে!

শুধুমাত্র কম্পিটেন্ট বলে কালীকৃষ্ণ গুহকে ঠিক খারিজ করা যাচ্ছে না। তাঁর কবিতা কম্পিটেন্ট তো বটেই, উপরন্তু নির্ভার নিরাভরণ, শ্লথ তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি যে একটি অত্যন্ত আধুনিক, প্রেমিক, ব্যঙ্গপ্রবণ মনকে বহন করে, এই ব্যাপারটি সতর্ক পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। আমরা চাই তিনি আরো একটু উৎসাহী হোন, যেমন এই গুচ্ছে "নেশা ও কোরাস" কবিতায় মাতাল যুবকেরা। তাঁর প্রেম অঞ্জুনাম্নী বন্ধ্যা রমণীকে অতিক্রম করে একাধিক উর্বরতার দিকে ধাবিত হোক।

কালীকৃষ্ণ গুহের ছয়টি কবিতা

আজ এই শেষ নভেম্বরে

ধুলো ও শুকনো পাতা উড়ে আসে আজ এই শেষ নভেম্বরে, আর
আমি একা এ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছি।
দূরে, ওই মাঠে, একটু পরে জমা হবে কাক, বেশ্যা, যুবক-যুবতী।
আরো পরে হিম, অন্ধকার।

একাকী মানুষ যায় মুখোশের থেকে কিছু দূরে, এই কথা জেনে
এখানে পাতার পাশে, শালপাতাদের পাশে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি—
কফি-হাউসের মিথ্যা হাস্যরোল, ধোঁয়া, উদ্‌ভ্রান্ত যুবক,
আজ ছোঁবে না আমাকে।

অনেক বছর গেছে। তুমি আছ শহরতলিতে।
তবু, ছাখো অঞ্জু, তোমার দিকেই আমি এগিয়ে চলেছি এইভাবে।

নেশা ও কোরাস

চারতলার ফ্ল্যাট থেকে মাতাল যুবকেরা গান গাইছে।
চড়া গলা। সুর কেটে যাচ্ছে বারবার।
ওদের সঙ্গে গান গাইছে ওদের একজন বান্ধবী, বিবাহিতা সে।

বেজে চলেছে পুরোনো নিস্তরঙ্গ হারমোনিয়াম। সুন্দর।
এগিয়ে চলেছে কোরাস, নেশা ও কোরাস, শীত, নক্ষত্র, নেশা ও কোরাস।

মাতাল যুবকেরা গান গেয়ে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে রাত্রি, জীবন।

চ'লে যাচ্ছি

চ'লে যাচ্ছি।

হয়তো অনেক কাজ ছিল— কিছু গ্লানি, অপমান, মুগ্ধতাও ছিল।
কিন্তু আজ চ'লে যাচ্ছি।

হেলমেট বুটজুতো পাশাপাশি প'ড়ে আছে আজ
প'ড়ে আছে মুখোশ, ব্যাটারি-কেস, নেম-প্লেট, বিজ্ঞাপন-বোর্ড
প'ড়ে আছে অভিধান, নম্র পেনসিল, প্যাড, টেবিল-ল্যাম্পের ছোট ছায়া
প'ড়ে আছে ক্যালেণ্ডার, নিসর্গ চিত্রটি
প'ড়ে আছে সাদা কাগজের পাশে শান্ত ঝুড়ি, হাত-পাখা জটিল দেরাজ-সহ
ঠাণ্ডা আলমারি
প'ড়ে আছে বিমূর্ত ফাইল—তার অন্তর্গত প্রতারক ভাষা

নিশ্চেতনা থেকে আজ সব-কিছু দেখে নিয়ে চলে যাচ্ছি

বাইরে বিকেল, জাদুঘর, রাত্রির প্রত্যাশা।

বুঝতে পারি না

অন্ধকার হয়ে আসে

তৃণ ও বৃক্ষের পাশে আমরা দাঁড়াই— দূরে মেঘ, অন্তরাল গন্ধর্ব-বিবাহ

কোন্‌দিকে যাব ঠিক বুঝতে পারি না।

অন্ধকার বাড়ি : কিছু স্বগতোক্তি

অন্ধকার বাড়ি। বহুদিন পর আজ এখানে এলাম।
পাশে হাস্নুহানার ঝোপ।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ফলে হাস্নুহানার গন্ধ
ছড়িয়ে পড়েছে।
একে কি প্রকৃতি বলা যাবে? চরাচর বলা যাবে?

প্রতিদিন নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে যেতে এইখানে আছ।
কবিতা লেখার দিন শেষ হয়ে গেছে। বয়স পঞ্চাশ হ'লো।
সারাদিন কত কাজ থাকে— রান্না, ধোয়ামোছা, ধুলো ঝাড় দেওয়া।
স্বামী ফিরবেন রাত্রি দশটায়।
তাঁর বুকে ব্যথা উঠেছিল ঠিক দুবছর আগে—
তিন মাস বিশ্রামে ছিলেন। ভয় হয়। তার ভালো হোক।

পাশের বাড়ির বৃদ্ধা আজ বিগত হলেন।
তাঁর শব নিয়ে যাওয়া হবে ওই পুরোনো লরিতে। ওর
ড্রাইভার কোথায়? ভালো গাড়ি নেই? শোক নেই? মৃত্যুই ভালো
ছিল তাঁর?
একটি দুটি তারা জ্বলছে— বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়।
বেহাগ রাগিণী নিয়ে জ্বলে? শুদ্ধ কল্যাণে?
দু'মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে আজ কিছুকাল হ'লো। তারা সুখী।
বড়ো মেয়েটির মেয়ে গান শুনে তবেই ঘুমোয়।

কবিতা ও শিল্পকলা ছেড়ে সকলকেই চ'লে যেতে হবে। তার আগে
কারো চোখে ঘুম থাকবে— হয়তো কারো চোখে আকাশ, নক্ষত্র, চরাচর।

জামশেদপুর, ডিসেম্বর ১৯৮২

কালো ধোঁয়া দেখা গেল—
আমরা তার দিকে দৌড়ে গিয়েছি।

হলুদ পঙ্কিল ধোঁয়া দেখা গেল
আমরা তার দিকে দৌড়ে গিয়েছি।

আমাদের মাথার উপরে ছিল বিষাক্ত আকাশ— নিচে, পাশাপাশি
স্টিরিও-সংগীত, মদ, উন্মাদ রমণী, পরিতৃপ্ত গোলাপ বাগান···

দিদিমণি

'ডাল্‌মা পাহাড় রেঞ্জ ওইদিকে—'
ব'লেই, কীভাবে পাহাড় সৃষ্টি হ'ল বুঝিয়ে দিলেন দিদিমণি।
আমি তাঁর ক্লান্ত সঙ্গী। ধুলো উড়ল।
পরে একদিন পাহাড়ের ভিতরে গিয়েছি।
দিদিমণি সঙ্গে ছিলেন। ক্লান্ত আজ।
তবু হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন জলপ্রপাতের উৎস ঠিক কোন্‌দিকে।
জল কিন্তু বস্তুত ছিল না—
ছিল জলের সন্দেহ ঘিরে পাথর ও গাছপালা, মলিন পিকনিক।

দিদিমণি, আপনাকে ছাত্রের মতোই ভয় পেয়েছি পাহাড়ে।

ঘাটশিলা, ১৯৮২

পনেরো বছর পর আবার ঘাটশিলা এলাম।
দশটায় ট্রেন এলো। সেইরকমই স্টেশন, সেইরকম আকাশ।
ভেবেছিলাম, একবার বিভূতিভূষণের বাড়ির দিকে যাব, একবার
সুবর্ণরেখায়।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হয় নি।
দুটো দিন বিশ্রামেই কেটে গেল। তা ছাড়া
সন্ধ্যার পর বাইরে বেরিয়ে দেখেছি, শীতে কুয়াশায় অন্ধকারে
অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার স্ত্রী ও ছেলে
অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধু, বন্ধু-পত্নী ও তাদের ছেলে
অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাস্তাঘাট, কুয়ো, ইউক্যালিপটাস গাছ।

স্বর্গলোক মর্তলোক

জ্যোতিময় ভট্টাচার্য

কাটোয়ার গদী থেকে প্রতিবারই আমাকে চৈত্র মাস পড়তে না পড়তে আদায়-পত্রে বেরোতে হয়। গ্রামদেশের আদায়-অস্থল—একেবারে ঠিক গৃহস্থের দরজায় গিয়ে হাত পাতলাম, আর বাকী বকেয়া সব মিটিয়ে দিল, এমনটি হয় না। এ খানিকটা কুটুম-সাক্ষাতের নিত্য আপ্যায়নের মত। এসেছ? বসো, দু' দণ্ড জিরোও, সুস্থির হয়ে কুশল নাও, এবেলা-ওবেলা দু' বেলা-দু' বেলা যাক। টাকা পয়সা! সে যাবার সময় হবে 'খন।

এই করেই উদ্ধারণপুর-নৈহাটিতে দিন দুই দেরী হয়ে গেল। আদায়-তশিল করে পথে আবার বের হলাম। এইবার বহড়ান-ঝামাটপুর-সালার হয়ে চাকটা আমগড়িয়ার দিকে যেতে হবে। মাঠের পথ ভেঙ্গে আল ছেড়ে বহাড়ানের পুবপাড়ার দিকে উঠতে যাব—ঠিক এ সময়ে দেখি আমার দশ-পনর হাত সামনে একজন মাঝবয়সী লোক দক্ষিণের আল ডিঙ্গিয়ে হন হন করে হাঁটতে সুরু করল। লোকটি বেশ নাদুস-নুদুস দেখতে। খালি পা, ধুতি হাঁটুর ওপর তোলা। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। এক হাতে বন্ধ ছাতা, তাতে গামছা বাঁধা। গায়ে হাফ সার্ট। শেষ চৈত্রের সকাল। মুড়ি খাওয়ার বেলা পার হয়ে তামুক খাবার বেলা ছুঁই ছুঁই। দশটা সাড়ে দশটা হবে। রোদের তাত ভয়ানক। কাদা মাটি ঝামা হয়ে যায়। খুব আশ্চর্য লাগল। এই রোদে হাতের ছাতাটাও লোকটা খোলেনি। পেছনে পথ চলতে চলতে অতটা বোঝা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে লোকটার সমান সমান পা ফেলে দু' চার পা এগিয়ে, তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললাম—

"দাদা নমস্কার। আজ্ঞে বহড়ানের পথ এইটিই তো?" ভদ্রলোক এক মুখ হাসলেন।

হাসিটি খুব সুন্দর স্বচ্ছ। কান পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। বললেন—"এজ্ঞে ঠিক পথই ধরেছেন।"

এরপর এক সাথে হাঁটতে গেলে দু' চার কথা বলতে-কইতেই হয়। জিজ্ঞাসা করি—মহাশয়ের নিবাস?

"সে অনেক দূর—দইধের পুবে পাণ্ডুগ্রাম। আমাকে এ পরশের (অঞ্চলের) সবাই চেনে। এ অধমের নাম ঈশ্বর ভবতারণ মুখুজ্জে।"

"ঈশ্বর মানে?"—আমি বিস্মিত হয়ে শুধোই।

"ঈশ্বর মানে আর কি! আসলে আমি এখন পরলোকে আছি।"

মৃদু হাসতে হাসতে ভবতারণবাবু বললেন। পথ চলতে চলতেই আমার মুখের ভাব তিনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। তাই একটু বোধ হয় দয়া হল। প্রাঞ্জল করে দিয়ে বললেন—

"খটকাতো লাগবেই ভাই। আপনার আর দোষ কি? গোটা জেলার গাঁয়ে গঞ্জে এই বছর দেড়েক ঘুরে বেড়াচ্ছি। জনে জনেই ব্যাখ্যা করে বলতে হয়। আসলে নিজের পিণ্ড নিজেই গয়ায় গিয়ে দিয়ে এলাম। তারপর থেকেই আমি পরলোকে। দেহটা শুধু চলে বেড়াচ্ছে।"

বললাম—এই ঘোর কলিতে এ্যাডভান্স পেমেণ্টটা কি ঠিক হল?

"আর মশাই ঠিক হওয়া আর না হওয়া। সন্তান অমানুষ হলে"—ভবতারণবাবু একটু বিষণ্ণ কণ্ঠেই বললেন। মনে হল কোথাও হয়ত চাপা দুঃখ আছে। তাই আর কথা বাড়ালাম না। মাথার ওপরে মাঠের রোদ। বেলা দশটা সাড়ে দশটা হবে। তার মধ্যে একজন বিদেহী মানব সন্তানের সঙ্গে পথ হাঁটছি—ভাবতে গিয়েও রীতিমত শিহরিত হলাম।

বললাম—দাদার ক্ষুধা তৃষ্ণা তাহলে?

"সব কি আর যায়, দেহবোধ তো আছে। বামুনের ছেলে তো বটি; রোজকার তর্পণের অধিকারী। তাই দিনান্তে একবার।"

পথ হাঁটছি। লোকটিকে লক্ষ্য করছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে ঈশ্বর ভবতারণ মুখুজ্জে নিজেই স্বগতোক্তির মত বলে উঠল—: মেয়েটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আজ দেড় বছর। একটা মাত্র মা মরা বিধবা মেয়ে। কোথায় যে আছে তার ঠিক নেই। ছেলেটা অমানুষ—আমার আবার আহার!

"আহার নেই বিহার তো আছে।"

"বললাম তো ভাই ঘর আজ দেড় বছর ছেড়েছি, বিহার তো বটেই।"

তারপর একটু থেমে খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—

"ভায়ার নিবাস ?"

"কাটোয়ার মালোপাড়ার ঘাটের গায়ে"।

"আচ্ছা ভাই—" বলতে বলতে পকেট থেকে একখানা বিবর্ণ ফটো বের করে বললেন—"একে কোথাও দেখেছ ?"

খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম বিবর্ণ একটি মেয়ের ছবি, ছবিটা হাতের ময়লায় তেল চটচটে হয়ে গেছে। আর বার বার পকেটে রাখা আর বার করায় দুমড়ে মুচড়ে একাকার। যে ছবি দেখে কাউকে চেনাই যায় না তার আর কি বলব।

বললাম—না ঠিক ধরতে পারছি না, তবুও এটি কার ?

"চিনতেই যখন পারা গেল না, তখন আর ঘরের কথা বলি কেনে ?"

কথা আরও হয়তো এগুতো। দু পা এগুতেই সামনে একটা বড় দিঘি পড়ল। তার পাড়ে পুরনো একটা বটগাছ। বেশ প্রাচীন। দিঘিটার প্রায় একটা দিক ছায়া করে আছে। ঈশ্বর ভবতারণ তার একটু দূরে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা মাটির ঢেলা তুলে গাছের গোড়া টিপ করে ছুঁড়তে লাগলেন। সাধারণতঃ মাইনর পাশ করার বয়স পার হয়ে গেলে অকারণে কেউ ঢিল ছোঁড়ে না বলেই জানতাম। তাই একটু বিস্মিত হয়েই শুধোলাম—"দাদা কি পাখিটাখি শিকারে হাত পাকাচ্ছেন ?"

"দেখছেন না, মন্ত্র পড়ে ঢেলা উৎসর্গ করছি"

"উৎসর্গ ? কাকে ?"

"ঐ বৃক্ষে দেবতার অধিষ্ঠান। যাতায়াতের পথে তাকে প্রণাম করে ঢেলা উৎসর্গ করলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। বিদেশী হয়েও বড় দুঃখে পথ চলছি গো।"

এবার আর পারলাম না। অনেকক্ষণ ধরেই দুঃখ-বিদেহী এসব ঝাপসা ঝাপসা কথা শুনছিলাম। এবার স্পষ্ট করেই বললাম—দাদা খুব যে বার বার দুঃখ দুঃখ করছেন গো! উত্তরে ভবতারণ বাবু মোটামুটি যা বললেন তাতে রীতিমত স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

ভবতারণ মুখুজ্জে পুরানো ঘরের পড়তি অবস্থার লোক। স্ত্রী অনেককাল গত। ছেলেটা অলস। রোজগারে মন নেই। বিয়ে দিয়ে সংসারী করেছেন। মেয়েটা বিধবা। বাপের কাছেই থাকত। দাদা-বৌদির সঙ্গে

ঝগড়া করে গত বছর দেড় বাড়ি ছেড়ে উধাও। মা মরা বিধবা ; তায় ছেলেমানুষ—সেই মেয়েকেই আজ দেড় বছর গ্রামে গঞ্জে মেলায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যদি সন্ধান পান অন্যকথা। আর যাই হোক এ নিয়ে দেশে গ্রামে ঢিটি পড়ে গেছে। মেয়েও ঘরে নেই আবার অপবাদ! তার চেয়ে বিদেহী হয়ে ঘুরে বেড়ানো ভাল।

আমরা সবটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। যাচ্ছি আদায়ের কাজে। কামনা বাসনা আমারও আছে। বিষণ্ণ মন নিয়ে রোমে এসে আমিও রোমান হলাম। পর পর তিনটে ঢিল উৎসর্গ করে মনে মনে প্রত্যেকবারই 'ওঁ ঢেলা বাবায় নমঃ' বলে নমস্কার করে, চার নম্বর ঢিল ছুঁড়ব কিনা যখন ভাবছি তখন ঈশ্বর ভবতারণ মুখুজ্জে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কোলে তুলে নেন আর কি !

বললেন—"সাবাস ভাই একেই বলে ভক্তি ! দেশ থেকে ধম্ম লোপ পায়নি গো।" ঈশ্বর ভবতারণ মুখুজ্জে আমার দেব ভক্তি দর্শনে যথার্থ প্রীত হলেন। আর এই প্রীতি থেকেই তার সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তা গড়ে উঠল।

কথায় কথায় দু' চার পা এগিয়েই হঠাৎ তার বোধহয় খেয়াল হ'ল। জিজ্ঞাসা করলেন, "তা ভাই উঠবেন কোথায় ?"

বললাম, "বাজারের আড়ৎদার নিরাপদ পালের গোলায়।"

পাল্টা শুধুতে হয়। বললাম—"আপনি ?"

এবার তার গলার স্বর কিছুটা ম্লান হয়ে এল। বললেন, "আমরা ভাই গাঁ বেড়াই, পাঁচ দোরে হাত পাতলে এক দোর খোলে। তবে হয়ে যাবে, কেউ না কেউ ঠাঁই দেবে।" তারপর আনমনে নিজেই বলল, "তা হোক আসবেন, আজ বিকেলে এখানে দুধকোমড়া, বুড়োরাজ শিবের গাজন, মেলাতলায় দেখা হবে।"

মেলাতলার কথা হিসেবের মধ্যে ছিল না। কিন্তু বিকেলে সেখানে ৺ভবতারণবাবুকে এমন বেশে দেখব, আশাই করতে পারিনি। বিকেল থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। পাল মশাইর গদী থেকে একটা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রাম্য মেলা—দু' চারখানা দোকানপাট, একটা নাগর দোলা, দু' চারশ লোকের ভিড়—আর এসব জায়গায় যেমন হয়। ওরই মধ্যে এক জায়গায় ভিড় চাক বেঁধে আছে। প্রথমটায় অতটা খেয়াল হয়নি, পরে ভাল করে দেখি—ও হরি, এ যে ভবতারণবাবুর খেল। একটা

ছাতা মাটিতে ত্রিশূলের মত পোঁতা। হাফ সার্ট'টা গায়েই আছে। তাকে ব্রাউজের মত রেখে পরনের ধুতিটাকে শাড়ির মত পেঁচিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন। হাত দুখানা ওপরে তুলে মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছেন, আর তারস্বরে গাইছেন "তুই শিব সোহাগী/শিব ভাতারী/শিবের ঘরণী/তোর কপালে পাগলা ভোলা/ক্ষেপা মহেশ্বর—আহা লোকে কি কবে।" তারপরই দু' হাত মাথার উপরে একত্রে তুলে জোরে তালি দিচ্ছেন, আর প্রত্যেকটা তালি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই বলছেন—"শিব হে কুরু তাং, শিব হে কুরু তাং " আর সেই তালে তালে মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে নৃত্য। দোর্দণ্ড নৃত্য। ত্রিশূলের মত পোঁতা ছাতাটার পাশে একটা গামছা পাতা। তাতে দু' চার পয়সা পড়েছে ঠিকই। বোধহয় ঐ সামান্য পয়সায় ৺ভবতারণবাবু খুশী নন। তাই মাঝে মাঝে গান থামিয়ে চেঁচাচ্ছেন—"কই গো জ্ঞান, বিদেহী ব্রাহ্মণের সেবাতে কিছু জ্ঞান—ভিড় ঠেলে উঁকি মেরে দেখলাম। আহা শেষটায় ৺ভবতারণবাবুকে এভাবে হাত পাততে হচ্ছে। দেখে মনটা খুব দমে গেল।

৺ভবতারণবাবুর সঙ্গে দেখা হল দিন দুই পর। এ বছরের হিসেব পত্র প্রায় মিটিয়ে স্টেশন হয়ে পালের গদী থেকে ফিরছিলাম। ছোট বড় গোটা দুই মাঠ পার হয়ে গ্রামের পথ ধরব। সন্ধে হয় হয়। হঠাৎ ঝড় উঠল। চৈত্রের সন্ধ্যা। ধুলোতে চারপাশ ঢেকে আসছে। এদিক ওদিক সবটাই ফাঁকা মাঠ। জানি এসময় বাজ পড়ে। মাঝ মাঠে দাঁড়াতে নেই। দু' পা এগিয়ে মাঠের জল চলাচলের একটা খাল-পোল। ছুটতে ছুটতে তার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু ধাতস্থ হয়ে চোখে মুখের ধুলো ঝেড়ে তাকাতেই দেখি সামনে ৺ভবতারণবাবু। সেই বোধ করি আমাকে প্রথমে দেখে থাকবে। খুব প্রসন্ন, এক মুখ হেসে বলল—"ভাই যে গো।"

বললাম—"এই মাঝ মাঠে ?"

"সব গুছিয়ে এখন ঘর পানে ফিরছি।"

"তা রোজগার পাতি কেমন হল ?"—আমি শুধোই।

"হল যা হোক মন্দের ভালো, ফাটা কপালে জলের দাগ।"

"জলের দাগ তো বুঝলাম। আপনি একা বিদেহী মানুষ। টাকা পয়সা কি হল বা হল না, তাতে আর কী যায় আসে ?"

হঠাৎ আবার ৺ভবতারণ দাদা মুহূর্তের জন্য খুব বিমর্ষ হয়ে গেলেন। খুব খাটো গলা করে বললেন—"নাচ ঢং, লোকের দোরে দোরে ঘোরা, ভাই এসব ছল মাত্র—আসলে মেলায় গঞ্জে, মেয়েটাকে খুঁজছি, সে কথা তো আগেও বলেছি ভাই।"

"মেলায় কি মাঠে ঘাটে আপনার মেয়েটা কি দাঁড়িয়ে থাকবে ?—আমি বিরক্ত হয়ে বলি।

"তা নয় ভাই, এর তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে গ্রামে থাকলে মেলাতে আসবেই।"

"দুঃখ পাবেন বলে বলতে বাধো বাধো ঠেকছে—ধরুন যদি না পান, এ বয়সে আর কতকাল ঘুরবেন ?"

"ঘোরা আর না ঘোরা, সংসারে আর মন নাইকো। এ জন্যেই তো মনটাকে একটু একটু করে পরপারে টেনে নিয়ে রাখছি। সংসারের মান-দুঃখ এখন কম বাজে। তবে মেয়েটাকে যদি পেয়ে যাই—"

খাল-পোলের নীচে চৈত্র শেষের ঝড় সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে আছি। চাপ চাপ অন্ধকার। ছায়া ছায়া। ভবতারণবাবুর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। গলার স্বর কেমন ভারী। জানি, এসব ক্ষেত্রে আর দু' চারটে কথা বললেই চোখের কোলে জল টলটল করে উঠবে। তাই প্রসঙ্গ বদলে বললাম—"সময় করে আমার কাটোয়ার বাড়ীতে আসবেন, যদি—"

"ওদিকটা হয়ে গেছে। তবুও মেয়েটাকে খুঁজে পেলে না হয় একদিন আহ্লাদ করে থেকে যাব।"

ঝড়ের বেগ একটু থেমে এসেছিল। হঠাৎ কিছু না বলে ঈশ্বর ভবতারণ দাদা খানিকটা পথ হন হন করে এগিয়ে গিয়ে কি খেয়ালে যেন থেমে পেছন ফিরে তাকিয়ে বললেন—"চলি ভাই, এই দেহটা আর তার কপাল না বদলালে আবার দেখা হবে।"

খাল পুলের নীচ থেকে বেরিয়ে এসে পথের শেষে মিলিয়ে যাওয়া ছায়াটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দু' একদিনের আলাপ। পরপর বার তিনেক দেখা হল। বলতে গেলে অচেনা একটা মানুষ। জানি না, কেন যেন সেই সন্ধ্যায় এই আধ চেনা আধ পাগলা লোকটার জন্য মনটা খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

এই ভবতারণবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল প্রায় মাস দশেক বাদে। অথচ এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় কি দরকারই বা ছিল এই দ্বিতীয়বারের দেখা হওয়ার।

মাঘের সুরু, সবে ধান কাটা শেষ। কিছু কিছু পয়সা ঘরে আসছে। সারা বছরের রোজগার। এবার খরা গেছে। ক্যানেলে জল দেবে না। তাই বোরো চাষ হবে বলে মনে হয় না। চাষ আবার আষাঢ়ে। খরা, তারপর সামনের বোরো চাষের আশা নেই—ক্যানেলের জল শূন্য। সবটা মিলিয়ে পাচুন্দীর গো-হাটায় এবার জলের দামে হালের বলদ গরু মোষ বিক্রি হচ্ছে। একেবারে পঞ্চাশের মন্বন্তরের দরে।

ছোট লাইনের গাড়ি। পাচুন্দী-কীর্ণাহার হয়ে আমাদপুরের দিকে যায়। মাঘী পঞ্চমীর পরের দিন। বেশ শীত শীত ভাব। স্টেশনে এসে একটু পুবে এগিয়েই একটা সান বাঁধান পুকুর। বেশ টলটলে জল। চারপাশে ঘেরা সুপুরির বাগিচা। যা এদেশে বড় দেখা যায় না। কেউ না কেউ যত্ন করে লাগিয়েছে। আজকাল এসব হিসেব উঠে গেছে। আগে লোকে পুকুর কাটিয়েই তাল সুপুরী চারপাশে লাগাত। বাতাসে পাতায় পাতায় খড়খড়ে আওয়াজ হবে। জলে সেইশব্দে মাছ ছোটাছুটি করবে ভয়ে। মাছ তাড়াতাড়ি বাড়বে। আর ভয় থেকেই তো আমরা বড় হই, বাঁচতে শিখি।

বাঁধান সিঁড়ি দিয়ে দু' চার ধাপ আনমনা এসব ভাবতে ভাবতে নামতে গিয়েই হঠাৎ খুব লজ্জা পেলাম। একজন আঠাশ ত্রিশ বছরের মহিলা জল থেকে সবে উঠছিলেন, আমাকে দেখতে পেয়েই টুপ করে আবার জলে ডুবে গিয়ে মাথা জাগিয়ে রইলেন। আমি অতটা বুঝিনি। মনে মনে ছিল, হাটের পুকুর। ঘাটে নামতে গেলে গলা খাকারি দেবার এখানে আর কিই বা দরকার। বাইরে এসে আবার দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট পাঁচ সাত বাদে মেয়েটি ঘাট ছেড়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে যাবার আগে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

—"বাড়ি কুনঠে গো আপনার?"

এসব ক্ষেত্রে কাটোয়া বললে অত সম্মান থাকে না। কোলকাতা বললে অনেক দোষের মার্জনা পাওয়া যায়। তাই আচমকা বলে ফেললাম।

—"কোলকাতা"

—"তখুনই বুঝেছি। সোনরন্দীর বাবুরা বিটি-ছাওয়ালের ঘাট বেঁধেছে বিদেশী না হলে সেখানে ঘেছ কেনে?"

আমার উত্তর রাঢ়ের মেয়েদের আমি ভালো করেই জানি। একদা একটানা চারশ বছর ধরে এখানকার মাটিতে মৃদঙ্গের বোল উঠেছে। অজয়ের দু' পাশের গ্রামে মধ্য রাত্রের নির্জনতায় কান পাতলে এখনও তা শোনা যায়। আর বামাচক্রে এখানকার নারীদের আত্মনিবেদনের কাহিনীর যদি একাংশও লেখা হত তাহলে রাজপুতানার সহস্র বীর রমণীর গৌরবকেও ম্লান করে দিতে পারত। এসব জানি বলেই মনে হল এবার মেয়েটি আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাবে। অচেনা পুরুষের সঙ্গে এখানকার মেয়েরা অতি সহজভাবে কথা বলে। আর এক্ষেত্রেও এক কোলকাতার মিথ্যে বলা ঢাকতে গিয়ে অকারণ অনেক বানানো কথা বলতে হবে। অনেক কথা সে বলবে। হলও তাই।

"এখানে কাদের বাড়ী উঠবেন?"—মেয়েটি শুধোল।

পাচুন্দীর হাটে গরু কেনা তখন আমার মাথায় উঠেছে। ভাগ্য ভাল আশেপাশের গোটা অঞ্চল আমার মোটামুটি চেনা।

বললাম—"কারো বাড়ি টাড়ি নয়।"

—"তাহলে?"

—"এইখানে স্নান সেরে একটা রিক্সা নিয়ে কেতুগ্রামের বাগদীপাড়ার মোড়ে নেমে বহুলাড়ার থানে যাব।"

—"দুপুরের খাওয়া দাওয়া?"

—"শুনেছি সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের সামনে একটা ছোটখাট হোটেল আছে।"

—"এত খবর নিয়ে কোলকাতা থেকে অ্যালেন আর ইটো জানেন না আজ মাঘী শুক্লা সপ্তমী।"

সত্যই শুক্লা সপ্তমীতে কি ঘটতে পারে, আমার জানা ছিল না। তাই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তাতে কি?

—আজ দইধের বৈরাগীতলার মেলা। পরশু ধুলোট। কোন সকালে বহুলাড়ার পুরুত ঠাকুরের পুজো সেরে ভোর রাতে মচ্ছবের প্রসাদ খেতে চলে যাবে।

আমি এইবার ঠেকে গিয়ে চোখেমুখে 'তাইতো' 'তাইতো' গোছের একটা

অসহায় বোকা বোকা ভাব ফুটিয়ে বোম্ ভোলা গোছের মানুষ হতে চাইলাম। আর কে না জানে নারী জাতির করুণা এ জাতীয় মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি।

কাচুমাচু মুখ করে বললাম—"আর কি হবে। ফিরতি ট্রেনে কোলকাতায় ফিরে যাব।"

মেয়েটি এবার খুব আপন জনের মত বলল—"তাই কি হয়? আমাদের দেশে এসে ঠাকুর দর্শন না করে ফিরে যাবেন? চলুন দুদিন না হয় বামুন বাড়ি—" কথাটা অর্ধেক বলেই বলল—

"আপনারা? অবশ্য গলার ফাঁকে পৈতে দেখছি।"

বললাম—"ঐ একই। ঠিকই দেখেছেন।"

মেয়েটি এবার খুব খুশী হয়ে বলল—"স্বজাতি গো স্বজাতি, এমন অতিথি কেউ ছাড়ে? চলুন হাটে দাদা আছে হালের একটা জুড়ি নেবে।"

—"আহা জুড়ির আর একটা কি হল"—আমি সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করি।

—"গত আমনে মাঠের সাপে খেয়েছে গো।"

—"আর আপনি? মানে, হাটে এলেন?"

—তেল সিঁদুরে বরণ করতে হবে যে। তা ছাড়া নিজের লেগে একটা গাই নেব। দুধ বেঁচে যদি প্যাটটা চলে। বলেই হেসে ফেলে বলল—

"স্বজাতি বলেই কথাটা খুলে বললাম।"

একটা মিথ্যার সঙ্গে আর একটা মিথ্যা জড়িয়ে এমন একটা জাল মুহূতে তৈরী হয়ে যাবে, আগে এতটা বুঝিনি। কি করে এর বাইরে বেরিয়ে আসব ভাবতে ভাবতে মেয়েটির সঙ্গে কখন যে হাঁটতে সুরু করেছি খেয়াল করিনি। হাটের কাছাকাছি এসে খেয়াল হতেই বললাম।

—"যাই ঘাট থেকে স্নানটা"—

—"এত সকালে আর ঘাট গিয়ে ডুবতে হবে না"—মেয়েটি বলল।

—"আপনি যে?"

—"আমাকে গাই-বরণ করতে হবে—মা ভগবতী বলে কথা।"

অগত্যা নিজে গো-হাটায় এসেও অন্যের গরু কেনা দেখছি। মেয়েটির দাদা আমাকে দেখে খুব একটা খুশী হল না। মুখে একরাশ বিরক্তি ফুটিয়ে বলল—"চলুন কেনে, মীরা যখন বলছে।"

মীরা একবার মাত্র মুহূর্তের জন্য দাদার মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—চলুন টলুন নয়, যাবেনই। বিদেশী লোক, তায় স্বজাতি। তখন এক রাত আমাদের ঠেয়ে কাটাতে আপনার বাঁধছে কোথায়? মা ভগবতীই আপনাকে পাঠিয়েছেন "বলেই মীরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দু' হাত জোড় করে প্রণাম করল।

ওর দাদা একটা ধমক দিয়ে বলল—"আকাশে পেন্নাম, বাতাসে পেন্নাম পরে করো গা, যে কাজে এলাম সে কামের ছঁস নেই।"

মীরার সঙ্গে যাচ্ছিলাম না হয় কথায় কথায় পথ কেটে যেত। মাঝখানে এই চোয়াড়ে দাদার আবির্ভাবে একটু কিন্তু কিন্তু ঠেকছিল। লোকটা যে সত্যি চোয়াড়ে একটু বাদেই ভাল করে বুঝলাম। একটা চার মাসের বাছুর শুদ্ধ, গাই মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। মীরা বলছে "তোমার গাইয়ের যা চেহারা এ চার বিয়ানীর কম যাবে না।" লোকটা ততই বলছে "মিথ্যে বলিনি ঠাকরুণ, হতে পারি মোছলমানের ছাওয়াল তবুও এ হল সাক্ষাৎ মা ভগবতী, এর নামে কি মিথ্যে হয়?"

কথা বাড়তে বাড়তে একটু তর্কের মত হতেই আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল "শিং-এর গোল দাগ গুণে দেখুন না।" তারপর হঠাৎ বাছুরটার দিকে তাকিয়েও খটকা লাগল। বললাম, "ওসব ছাড়ান দাও চাচা, বক্‌নার মুখের আদলে মার মুখের মিল নেই গো, মা টোকে দৌড় করাও গো—বাছুরের নড়ন চড়ন দেখ। তবে তো কেনাকাটা।"

বলার সঙ্গে মীরার মুখটা খুব উজ্জ্বল হল। তার কোন কথা বলার আগেই সেই চোয়াড়ে দাদা বেশ একটু সন্দেহের স্বরে বলল—"কোলকাতার বাড়িতেও বুঝি গাই পুষেছেন?"

মীরা একথায় রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল—"দাদা তোমার এঁড়ের জুড়ি তুমি খোঁজ গা, আমার কাজ আমি একাই পারব।"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর দাদার কি হলো কে জানে—সটান হাটের অন্য পাশে গোঁ মেরে সরে গেল। মীরাকে যে তার জন্য খুব একটা চিন্তিত তেমনও মনে হল না। হাজার হোক একজন মেয়েমানুষ আদর আপ্যায়ন করে বাড়ি ডেকে নিয়ে যাচ্ছে অথচ তার দাদা চাইছে না—এরকম একটা পরিস্থিতিতে, আমার যে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব, বোধ হয় সে তা লক্ষ করে থাকবে। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বেশ তেজের সঙ্গেই বলে উঠল—

"আমিও ভবতারণ মুখুজ্জের বিটি গো, হতে পারি বিধবা এখনও নিজের পয়সায় খাই, তোর দাদাগিরির ক্যাথায় আগুন।"

আমি চমকে উঠে মুখ ফস্‌কে বলে উঠলাম—"ভবতারণ? ৺ভবতারণ মুখুজ্জে? তিনি যে আমার দাদা হন গো—"

মীরাও ততোধিক চমকে উঠে বলল—"কি সুবাদে?"

এক পলকেই ধাতস্থ হয়ে মনে হল, ৺ভবতারণবাবু হয়ত কখনও কোলকাতা যাননি। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললাম—"সে অনেক কথা। বললে মহাভারত।"

মীরাও বিশেষ চাপাচাপি না করে বলল—"যেতে যেতে শুনব 'খন।"

তারপর আনমনেই বলল—"কে জানে আপনি আমাদের আর কি কি কথা জানেন। সব জানলে বামুন-অতিথিই আবার হাত ছাড়া না হয়।"

পাচুন্দীর কাছেই যে পঞ্চগ্রাম আর সেখানেই যে ৺ভবতারণ মুখুজ্জের বাড়ি, মাস দশেক আগে শুনে থাকলেও আমার ঠিক অতটা খেয়াল ছিল না। আর ভবতারণের কাছে যে বিবর্ণ ফটো দেখেছিলাম সে স্মৃতিও মুছে গেছে। তবে ফটোতে কি দেখেছিলাম মনে নেই। এখন দেখলাম মেয়েটি যথার্থ সুন্দরী।

সত্যি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে মীরা একা একাই গাই নিয়ে অনেকটা পথ চলে এল। একপাশে আখের ক্ষেত। পাশ দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ। তারপরেই বিরাট চওড়া খাল। এদেশে বলে কাদোর। বেশ গভীর। অজয়ের লাল জল অনেককাল আগে এসে এখন বেশ স্থির, টলটলে। গাই-বাছুর আর আমরা দুজন হাঁটছি। মাঘের উত্তরায়ণে সবে ঘুরে যাওয়া সূর্যের আলো তেরছা হয়ে আমাদের বাঁ পাশ দিয়ে হেলে যাচ্ছে। ডান পাশে কাদোরের জলে চারটে ছায়া তরতর করে এগুচ্ছে। এদিকটার সবই চাকরান জমি। আখের ক্ষেত পার হয়েই কলাইয়ের ক্ষেত। হলদে হয়ে এসেছে। তার চেয়েও গাঢ় হলুদ পাশের সরষে ক্ষেত। একটা মিষ্টি গন্ধ। বুক ভরে টানতে টানতেও শেষ হতে চায় না। আসন্ন ফাল্গুনের গোটা বাংলাদেশের মাটির গন্ধ প্রথম সরষে ফুলের মধ্যেই ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে ওঠে। পথ হাঁটছি অথচ মীরা চুপচাপ। আমিই প্রথম কথা বললাম—"তুমি হলে গিয়ে ৺ভবতারণ দাদার মেয়ে, অথচ এত কথা বলে এখন চুপচাপ কেনে?"

মীরা খুব বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—"চুপচাপ নয় গো, চারচাকলার কোন চেনা

মানুষ আমার ঘরে অতিথি হবেক নাই, আপনি আমার কপালে টিকবেন কি না কে জানে!"

এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিনি, এবার স্পষ্ট করেই বললাম—"একজন অতিথি ঘরে নেবার জন্য এত পাগল হচ্ছ কেন একটু খুলে বলত?"

"আপনি বাবার ভাই, সে যে সম্পর্কেরই হোক, আপনাকে বলা যায়, এই গাইটা সের দুই দুধ দিলেই আমি আর দাদার অন্ন খাবো না। স্বাধীন হব।"

"বেশ তো—"

"বেশ তো নয়, আমার আবার পাপের দেহ, তাই সকালে স্নান সেরে একজন ব্রাহ্মণ সেবা দিয়ে তারপর নতুন অন্ন শুরু করব। ভগবান আপনাকে মেলালেন।"

"কি এমন পাপ?" আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

"না না যা ভাবছেন সবটা তা নয়, তবুও মেয়েদের পাপ মেয়েরা নিজের মুখে কি কখনো বলে?" মীরা খানিকটা প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই আবার বলল —"কাকা সে সব কথা থাক।"

'থাক' না বললে আর কি করা। তবে এটা বুঝলাম মেয়েটার জীবনের একটা পরিবর্তন আনতে চাইছে। ব্রাহ্মণকে খাইয়ে সকালে স্নানটান সেরে সেই নূতন জীবনের সুরু হবে।

প্রায় পড়তি বেলায় ৺ভবতারণবাবুর বাড়ি পৌছলাম। বেশ সেকেলের পুরনো একতলা পাকা বাড়ি। এদেশে পাকা বাড়ি সব গ্রামে থাকেও না। অথচ এত অযত্নে এই বিশাল বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ভাবলে বিস্ময় লাগে। জানলা দরজার বালাই নেই। তার বদলে এখানে সেখানে চট ঝুলছে। বারো আনাই বট অশ্বত্থে ঢাকা। সাপেদের বসবাসের আদর্শ স্থান। নিতান্ত মাঘের সুরু। নইলে এর ধারে কাছে আমিই থাকতাম না। নিজেকে পরলোকে না পাঠালে যথার্থ ভাবেই এখানে বাস করা যায় না। মীরা গাই আর বাছুরটাকে একটা পুরনো থামের সঙ্গে বেঁধে, এক ঘটি জল এনে পা ধুইয়ে দিল। তারপর শাঁখ বাজিয়ে গাই-বাছুরের কপালে তেল হলুদ দিয়ে বরণ করল।

এখানে এসে থেকেই ৺ভবতারণবাবুকে খুঁজছিলাম। মীরাকে বার দুই শুধোলাম। দু'বারই গা ছাড়া গোছের উত্তরে বলল—'যেছে কোথাও'। বিরাট বাড়িটার মধ্যে গোটা চারেক ঘর কোনরকমে গুছিয়ে নিয়ে এরা থাকে। তার কোথাও ৺ভবতারণবাবু আছেন বলে মনে হল না। রাতে

খাওয়াদাওয়ার সময়ও ৺ভবতারণবাবুর দেখা নেই। কিছুই নয়, একবার তারই বাড়িতে রাত কাটাচ্ছি, আর লোকটার সঙ্গে একবারও দেখা হবে না এ কেমন কথা! শুতে যাবার আগে মীরাকে বললাম—"কাল সকালেই আমাকে ছেড়ে দিও কিন্তু"।

সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে যা হয়—"না আর একটা বেলা থেকে যান, গরীবের বাড়িতে এলেনই যখন"—এ ধরনের কথাবার্তার কিছুটা ভাঁজ থাকে। সেসব কথায় প্রাণ থাকুক না থাকুক দু' চারবার বলতেই হয়। আশ্চর্য, মীরা বরং উল্টো বলল—"যাবেন বৈকি! কাল খুব ভোরেই আপনাকে ডেকে দেব খন।" আমি একটু পরিহাস করেই বললাম—"সে কি! তুমি আমাকে আর একবেলাও থাকতে বললে না?"

"এই একবেলার জন্যই কত হেনস্থা"—বলতে বলতে তার চোখের কোলে জল টলটল করে উঠল। ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে, অস্পষ্ট আলো-অন্ধকার চুণ বালি ওঠা জীর্ণ দেয়ালে ছায়া ফেলেছে। চারদিকে জীর্ণতার ছাপ। অভাবের একটা ছায়া আছে। এই আলোছায়ার সঙ্গে তা বেশ মিলেমিশে ঘরের হাওয়াটাকেও ভারী করে তুলেছে। একটা পুরানো আমলের দেশী দামী চৌকির উপর বসে আছি। মীরা কয়েক হাত দূরে মেঝেতে দাঁড়িয়ে। শরীরের ডান পাশটায় হ্যারিকেনের আলো পড়েছে, অন্য দিকটায় ছায়া। সকাল থেকেই বলতে গেলে মীরার সঙ্গে সঙ্গে আছি। এই প্রথম ওকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, এমন একজন সুন্দরী নারী জীবনে দু' একবারই চোখে পড়ে। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখলাম এক ফোঁটা জল ওর চিবুকের মাঝামাঝি এসে স্থির হয়ে কাঁপছে। নীরবে অশ্রু বিসর্জনের মধ্যে বেদনা আছে ঠিকই কিন্তু সেই অশ্রু পতনের মুহূর্তটি অপার্থিব।

—তাহলে কি দরকার ছিল আমাকে এত আদর আপ্যায়ণ করে ডেকে আনার? যাতে আমার কথায় সে আঘাত না পায় তেমন নরম কণ্ঠেই আমি বলি।

মীরা মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে বলল—"আমার বাবাকে আপনি যখন চেনেন তখন এটাও বোধ হয় জানেন যে কিভাবে তিনি দু' চার টাকা রোজগার করেন।"

বললাম—"কিছু কিছু জানি বৈকি।"

মীরা যেন আশ্বস্ত হল। বলল—"সেই রোজগারের প্রায় সবটাই আমার জন্য খরচ হত। তাইতে দাদার রাগ। তারপর একটু থেমে বলল, "সেই জন্যই অনেক পথ ঘুরে এখন এই গাই কেনা, সের দুই দুধ বিচতে পারলে একটা বিধবার প্যাট কোনরকমে চলে যাবে।"

"সে তো বুঝলাম, সেখানে আমাকে না ডাকলে কি এসে যেত।" আমার কথা শেষ হতে না হতেই সে বলল—"সে কি গো, ব্যবসা শুরু করলাম, এবার থেকে সৎভাবে বাঁচব, একজন ব্রাহ্মণ সেবা দিয়ে কাজ সুরু করতে হয় না!"

"বামুন কি আর এ গাঁয়ে নেই? খাস কোলকাতার না হলেই নয়"—আমি বিস্মিত হয়েই বলি।

"গাঁয়ের বামুন আসবে না গো, আসবে না"—বলতে বলতে মীরা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

গতকাল সন্ধ্যেতেও এই মেয়েটিকে আমি চিনতাম না। অথচ আজ এর দুঃখ আমাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, কাল ভোর হবার পর আর জীবনে কখনোই হয়ত এর সঙ্গে আর দেখা হবে না। চতুর্দিকে অনন্ত বিশ্ব-জীবন—নিজের নিজের বৃত্তে প্রত্যেকে আবর্তিত হচ্ছি। মাঝে মাঝে একজন অন্যজনকে আমরা ছুঁয়ে যাচ্ছি মাত্র। মিনিট চার পাঁচ একটা নীরবতার মধ্যে কাটল। মীরা একটু ধাতস্থ হলে বললাম—

"কেন, গোটা গাঁয়ের তোমরা কি ক্ষতি করলে?"

"আমার চালচলন নাকি ভাল নয়"—খুব সঙ্কোচের সঙ্গে মীরা বলল।

"তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি, আর এই একঘরে করার ব্যাপারও তো সেকেলে ব্যাপার"—আমি সহানুভূতির সঙ্গে বলি।

আসলে এ গাঁয়ে ছিলাম আমরা সম্মানী ঘর, আজকাল যাদের মান নেই তারা আমাদের ছোট করে বড় হতে চায়।

আমি আনমনেই ভাবি—"মধ্য বিত্ত ভেঙ্গে অভাবী মানুষ হচ্ছে, আর সমাজ ভেঙ্গে হচ্ছে দল"

তবুও কৌতূহলের সঙ্গেই বললাম—তোমার দাদা?

"আর দাদা! নিজের জমিজমা বেঁচে খেয়েছে, গত দু' বছর ধরে সে এখন ভাগচাষী। পরের জমি চাষ করে তার কথার এখন কি দাম!"

তারপর হঠাৎ গলা খাটো করে বলল, "বছর খানেক আমি মেলায় মেলায় ঘুরতাম, সে পয়সাও ভেঙ্গে খেয়েছে।" মেলায় মেলায় ঘুরতাম মানে? মনে

খুব খটকা লাগল। অথচ এ যে সহজে বলল তাতে কেমন করে যেন চুপ করে গেলাম।

আরও একথা সে কথায় শুতে শুতে একটু রাত হল। মীরা যাবার সময় খুব কাতরভাবে বলে গেল—"আশীর্বাদ করবেন, যেন আমার দুধের ব্যবসা আমাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখে।"

কি আর বলব। আমি ভগবান সিদ্ধার্থ বা মঠের বাবাজী নই। আমার আশীর্বাদের কি যে ক্ষমতা সে তো আমিই জানি। তবুও মানুষকে আশা দিতে হয়। নইলে বাঁচবে কি দিয়ে। বললাম—"না না তোমার হবে, ভালোই হবে।"

॥ ৩ ॥

অনেক রাত অবধি চোখে ঘুম আসছিল না। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। শীতের রাত। জানলায় পাল্লা নেই। সারের পলিথিনের ব্যাগ টানানো। তার ফাঁক দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। এলাম ভবতারণ মুখুজ্জের বাড়ি সে বোধ হয় কেঁদুলীর মেলা শেষ করে উজানী, উজানী পার করে আজ দধিয়ায় গিয়ে পৌছেছে। আবার হয়ত তিন দিন বাদে দধিয়ার পরের মেলা ফুল্লরায় যাবে। অভাবের তাড়নায় তার মেয়েটা ঘর ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, পরলোকে মনপ্রাণ রেখেও ইহলোকে সন্তানদের বাঁচাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এলোমেলো ভাবনা ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রার মত এসেছে—হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা ঝগড়ার শব্দ কানে এল। কথাবার্তার চাপা স্বর। শীতের নিশ্চুপ রাত। খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তিন চারটে গলা, তার মধ্যে মীরা আর তার দাদার গলাই বেশি। ওর দাদা বলছে—"দু' বছর আড়াই বছর গঞ্জে মেলায় ঘুরে আসতে পারল আর এখন সতী সাজবি। বাবা এখনও মেলায় মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর উনি আমাকে অন্য কথা শেখাচ্ছেন।"

"বলেছি তো যা করেছি করেছি আর নয়।"

"কি ক্ষতি হত তোর দধিয়া মেলায় মাসীপাড়ায় আর তিনটে রাত কাটাতে? নষ্ট যখন হয়েইছিস আর তিনদিনে কি মহাভারত চলে যেত?"

"বলেছিত আর নয়"।

"খরার বছর শ' দুই টাকা এলে তোর কি আর নতুন বদনাম হবে?"

"যে পথ ছেড়েছি—"

"আহা উনি ছেড়েছেন!"

"যাই বল দাদা ব্রাহ্মণ সেবা করে নতুন করে জীবন সুরু করছি। যাব না, যাব না।"

এবার মীরার দাদা কতকটা অনুনয়ের স্বরেই বলল—"আমার সংসারের দিকে তাকিয়ে আর একবার না হয় ঘুরে আয়, তিনদিন বই তো নয়। এবার খোঁজ নিয়েছি কান্দরার নীলু ডাক্তার দধিয়া থেকে মাসীপাড়া তুলে দিচ্ছে, রাজুরের কাদোরের ধারে কাসেম মিঞা দু শ ছাউনি তুলেছে—গাঁয়ের লোকও টের পাবে না।"

মীরাও ততোধিক মিনতি করে বলে—"দাদা ছাড়ান দাও সাঁইথিয়ার গঞ্জে থাকতেই কানে গেছে বাবা পাগলের মত আমাকে মেলায় পাড়ায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন ঘরে ফিরেছি আর নয়।"

"আহা হা গো ঢং। কাসেম মিঞার ছাউনিতে কত ঘর গেরস্থ শুদ্ধু যাচ্ছে আর উনি"—ওর দাদার কণ্ঠস্বর।

তারপর খানিকটা নীরবতা। একটা মেয়ের গলা এবার শুনতে পেলাম। বোধ হয় ওর বৌদিই হবে, প্রায় অনুনয়ের স্বর—"ঠাকুরঝি তুমি মযুরাক্ষীর জংশন পোলের কাছে কাটাতে পারলে, আর তিন চারদিনের লেগে ঠাকরুণ হলে গা।" আমি বলি কি যাও না কেনে—এ তল্লাটে মেলায় কত লোক অভাবে যায়, তারা আর ঘর করে না? ছেনালি—

ওর দাদা বোধ হয় অনুরোধ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবু একবার ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—"এখন যা, ফাল্গুনে না হয় আমগড়িয়ার সতী মায়ের থানে দণ্ডী খাটিস।"

এতক্ষণ মীরার কণ্ঠ একবার দু' বার শোনা যাচ্ছিল। এইবার খুব স্পষ্ট করে বলল—"জংশনের গঞ্জে দইধের মেলার এক দোকানী আমার ও ঠাঁয়ে যেত। তাকে খবর দিয়েছি যে আমি গাঁয়ে ফিরছি। বাবা আজই খবর পাবে। ফিরে এসে আমাকে না পেলে?"

"আহা, এতকাল বাপ সোহাগীর বিবেক বালাই ছিল কুথা"—ওর দাদা ব্যঙ্গ করে।

"ঘর ছাড়লে বাবা যে এমুন পাগল হয়ে ঘুরবে কে জানত? মোট কথা আমি যাব না। গাইয়ের দুধ বিচতে পারলে আমার একটা মানুষের—"

"কড়ে রাঢ়ীর সতীপনা"—ব্যঙ্গের স্বরে ওর দাদা বলল।

এরপর খানিকটা নীরবতা। তারপর একটানা ফোঁপানির শব্দ। তার

মাঝে মাঝে দু' একটা কথা।—"আমার কপাল ভেঙেছে·····তাই বলে তোমাদের ঘরে হাত পাতিনি····· বাপ পাগলের মত এখানে সেখানে আমাকে খুঁজছে ····· তার দুঃখ দেখে ফিরে এলাম·····নইলে কে আসত তোদের এই পোড়া ভিটেয় ··"

ভাইবোনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান। শেষটায় কান্না। বৌদির কণ্ঠ। এক বিচিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভোর হল। আমার ফেরার পথে পঞ্চ গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত মীরা এগিয়ে দিল। গ্রামের শেষ সীমানার কোলের জমিতে নেমে আড়াআড়ি বহুলাড়ার ঢিবির দিকে যখন পা বাড়িয়েছি তখন মীরা বলল—"কাকা আবার এদিকে এলে আসবেন বলতে বলতে গড় হয়ে প্রণাম করল।"

বললাম—"আসব, তবে ৺ভবতারণবাবুর সঙ্গে আর দেখা হল না।"

মীরা বলল—"পথেও হয়ে যেতে পারে, কারণ বাবা এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছে যে আমি গাঁয়ে ফিরেছি।"

মীরার কথাই ঠিক। কেতুগ্রামের রেজিষ্ট্রি অফিস ছাড়িয়ে বাগদী পাড়ার মুখেই দাদার সঙ্গে দেখা। প্রথমটায় উনি ঠিক চিনতে পারেননি। পরে লজ্জা পেয়ে বললেন—"ভুল হয়ে যায় ভাই, গুলিয়ে ফেলি, এখানে সেখানে কত লোকের সঙ্গে যে দেখা হয় ঠিক সব চট করে মনে আসে না। কিছু মনে করো না ভাই।"

"তারপর ভাই ইদিকে?" ৺ভবতারণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। সত্যি কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। হাজার হোক মীরার কাছে আমি কোলকাতার লোক হয়েই বিদায় নিয়েছি। ৺ভবতারণবাবু বাড়ি ফিরলেই সেসব মিথ্যে ভেঙ্গে যাবে। থাক কি দরকার। বললাম—"এই বহুলাড়ার মন্দির থেকে।"

"তা বেশ বেশ"—ভবতারণবাবু খুশী হলেন।

বললাম—"দাদা কি এখনও পরলোকে আছেন?"

"এখন অবধি পরলোকেই। তবে আজ বাড়ি গিয়ে সব দেখে শুনে আবার ইহলোকে ফিরতেও পারি।"

আমি না বোঝার ভান করে বললাম—"হঠাৎ আবার?"

৺ভবতারণবাবু বললেন, "তোমাকে সব বোঝাতে পারব না ভাই তবে সন্তানের টানে।"

দু' চার কথার পর ভবতারণবাবু মাঠের দিকে পা বাড়ালেন। লোকটির বড় বড় পা ফেলে ঘরের দিকে যাওয়ার তাড়া দেখে আমার বার বার মনে হতে লাগল কি দ্রুত একটি লোক পৃথিবীতে পুরোপুরি ফিরে আসতে চাইছে। অভিমানে কত লোক এই পৃথিবী থেকে সরে যেতে চায়। শেষটায় ফিরে আসে। একটু পরেই হয়তো অনন্ত মানুষের মহা মিছিলে আবার ভবতারণবাবু মিশে যাবেন। একজন অতি সাধারণ আবার এই পৃথিবীর লোক!

সাময়িক প্রসঙ্গ

কার্ল মার্কস

প্রদীপচন্দ্র বসু

(জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে)

রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ হিসাবে এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারার জন্য আজকের পৃথিবীতে কার্ল মার্কস এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। এই বিচারে তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবী জুড়ে, যা তুলনাহীন। ১৮১৮-তে পুরানো জার্মানীর ট্রায়ার শহরে কার্লের জন্ম। বাবা ছিলেন ইহুদি আইনজীবি, পরে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করেন এবং ১৪ মার্চ ১৮৮৩-তে লণ্ডনে মারা যান। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বসবাস করেন, মার্কসের তত্ত্ব মেনে শাসনব্যবস্থা চালানো হয়। এককথায় বিশ্বের কম্যুনিস্ট দেশগুলির শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি রচিত হয়েছে মার্কসের প্রদর্শিত পথে। মার্কস এমন এক রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিলেন যার মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের স্বর, বিশ্বের সব দেশের সমান হারে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। তাঁর মৃত্যুর একশো বছর পর আজকের দুনিয়ায় 'মার্কসিজম' তিনটি স্বতন্ত্র ধারায় চিহ্নিত হয়েছে; আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক চেতনার তত্ত্ব, মনুষ্য সৃষ্ট দুঃখদুর্দশার হাত থেকে নিপীড়িত জনগণের উদ্ধারের অস্ত্র এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একমাত্র বিকল্প।

মার্কস ছিলেন হেগেলের আদর্শে বিশ্বাসী। তবে অন্ধ বিশ্বাস তাঁর ছিল না। চোখ খোলা রেখে তিনি হেগেলকে অনুসরণ করেছেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি ছিলেন বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন। পুঁজিপতিদের তিনি ছিলেন কড়া সমালোচক। তাঁর সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর পরিবর্তনের বাসনার জন্য তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল প্যারিস, ব্রাসেলস এবং শেষে থেকেছেন লণ্ডনে। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (১৮২০-১৮৯৫) সঙ্গে তাঁর ছিল আজীবন বন্ধুত্ব এবং এই

এঙ্গেলসকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর আবিষ্কৃত সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তত্ত্বই সঠিক যা আগামী দিনে অন্য সব সমাজতন্ত্রের চেতনাকে ভুল বলে প্রমাণিত করবে।

কার্ল মার্কসের প্রথম দিকের (১৮৪৩-৪৪) চিন্তাধারায় ছিল দর্শন এবং শ্রমজীবী শ্রেণীর মানসিকতার মিশ্রণ। ভ্রান্ত রাজনীতির অত্যাচারে পরিণত ক্রীতদাস প্রথার হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করার আন্তরিক বাসনায় তিনি পরবর্তীকালে রচনা করেছিলেন বিপ্লবের জন্য আর্থিক এবং সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব। এই তত্ত্ব নিয়ে তৎকালীন নিয়মতন্ত্রে বিশ্বাসী সমাজবাদী সমালোচক এবং উদার অর্থনীতিবিদ্দের সঙ্গে প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা হয়। অথচ এই সমালোচক ও অর্থনীতিবিদরাও কিন্তু সেই সময়ে প্রচলিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন, যদিও তা মার্কসের পথে নয়। মার্কসীয় তত্ত্ব ঘোষণার সময় ইংল্যাণ্ড শিল্প-বিপ্লবের গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়ার মুখে এবং যার মধ্যে লুকিয়েছিল সামাজিক ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী ধনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বীজ। ম্যানচেষ্টারে এঙ্গেলসও কাপিটালিজমের এই সুদূরপ্রসারী করাল ছায়াকে পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতের দুর্দিনকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

১৮৪৮-এর বিপ্লব নিপীড়িত জনগণের আন্তর্জাতিক আন্দোলনে দিক নির্দেশ করেছিল এক সুস্পষ্ট নতুন পথের, যে পথ অতিক্রম করে গিয়েছিল বহু প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বাধাকে চূর্ণ করে, অতিক্রম করেছিল বহু দেশেরই আন্তর্জাতিক সীমানা। সেই সময়ের 'ইউটোপিয়ান' সমাজ ব্যবস্থাকে যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্কস তৈরী করেছিলেন ইতিহাসের এক আড়ম্বরপূর্ণ অধ্যায়। এই নির্মাণে ব্যবহার করেছিলেন অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচারমূলক চিন্তাধারা যা ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে এনেছিল বহু অজানা তথ্য। ১৮৪৮-এর গোড়ায় প্রকাশিত 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তে এই তথ্যগুলিকে এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যা পরবর্তীকালে মার্কসীয় তত্ত্বের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করে। লণ্ডনে জার্মান সোসালিস্টদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'কম্যুনিস্ট লীগ' এই পুস্তিকা রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মার্কস এবং এঙ্গেলসের ওপর। এই ম্যানিফেস্টোর রাজনৈতিক এবং বৈপ্লবিক আবেদন, অর্থনৈতিক জট খোলার চেয়ে ছিল অনেক বেশি। "কম্যুনিস্ট বিপ্লবের কথা ভেবে কেঁপে উঠুক সমস্ত শাসক

গোষ্ঠী। শৃঙ্খল ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর আর কিছু হারাবার ভয় নেই। বিশ্ব বিজয়ের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে তাঁরা। সব দেশের শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হও!"

ওপরের উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি কিন্তু মার্কসের লেখা নয় যদিও এর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে মার্কসীয় পথে যুদ্ধের আহ্বান। ১৮৪৭-এ 'কম্যুনিস্ট জার্নাল'-এর আদর্শ বাণী হিসাবে এটি আগেই প্রচার করা হয়েছিল। প্রথমদিকে 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-র প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই সামান্য। অন্যদিকে ১৮৪৮-এ জার্মানীর বিপ্লব দরিদ্র ও সমাজতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ অপেক্ষা পুঁজিপতি ঘেঁষাই ছিল বেশি। তবে এই ম্যানিফেস্টোতে ছিল 'মার্কসস্ট ডক্ট্রিনের' সার্বিক রাজনৈতিক সূচনা। আর, এর মধ্যেই ছিল ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের দার্শনিক চিন্তাধারা, তাঁর অর্থ নৈতিক তত্ত্ব এবং বৈপ্লবিক রাজনীতি। মানুষের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসিজম তত্ত্ব প্রচারের আগে পর্যন্ত সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতি সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় শ্রেণী বৈষম্য দূর করতে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে এই শ্রেণী বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল দূর করার ছলে। শ্রমিক আর পুঁজিপতি—দুটি বৃহৎ দলে ভাগ করেছিল আপামর জনসাধারণকে, দাঁড় করিয়েছিল মুখোমুখি শত্রুতায়। শাসক দলের অন্তরালে থেকে দেশ শাসন করেছে পুঁজিপতিরা! আর এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধু দলে ভারী করেছে নিপীড়িত মানুষদের, ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং সচেতন করে তুলেছে তাঁদের নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে। ফলে অতীতের সামাজিক আন্দোলনের তুলনায় পরবর্তীকালের সামাজিক আন্দোলনে অনেক বেশি সংখ্যায় মানুষ অংশগ্রহণ করেছে।

এই আন্দোলনের মাধ্যমে মার্কস চেয়েছিলেন সামগ্রিক বিপ্লব। তাঁর মতে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার না করে নিপীড়িত জনগণের উত্থান সম্ভব নয়। পুঁজিপতি সমাজের তৈরী আইন, নীতিবোধ এবং ধর্মাচরণ—সবেরই মুখোস খুলে দেওয়া দরকার। এজন্যে প্রথমে বৈপ্লবিক সংগ্রাম করতে হবে জাতীয় স্তরে এবং ক্রমশ এর মধ্যে ঢোকাতে হবে আন্তর্জাতিক লক্ষ্যগুলি। সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে গঠন করতে হবে একটি শ্রেণী যা পুঁজিপতি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দখল করবে রাজনৈতিক ক্ষমতা। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি এবং অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ প্রথার উচ্ছেদকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে এই রাজনৈতিক সংগ্রাম। অনেকের মতে এই আন্দোলনে অগণিত মানুষের অংশগ্রহণের কথা ভেবে

মার্কস হয়ত বেশি আশা করেছিলেন। অতীতে এ ধরণের আন্দোলনে কখনোই কোন দেশে শতকরা নব্বই ভাগ লোকও অংশগ্রহণ করেনি। এখনো কি করছে এছাড়া ভবিষ্যত সম্পর্কে মার্কসের চিন্তাধারাকে অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিত নিছক অনুমান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে রাজী নন। বিপ্লবের পর উৎপাদনের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে রাজ্যের হাতে, অর্থাৎ নিপীড়িত মানুষ শাসক শ্রেণী হিসাবে তা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং একই সঙ্গে মোট উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে হবে যার মধ্যে শ্রমিকও আছে। এই বাড়িয়ে তোলার প্রথম উপায় হবে 'স্বেচ্ছাচারী মধ্যস্থতা' এবং পরে তা করতে হবে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে। এখনো পর্যন্ত মার্কসিজম নিয়ে যেসব তাত্ত্বিক ও রাজনীতিবিদরা কাজ করেছেন, তাঁদের মতে এই 'স্বেচ্ছাচারী মধ্যস্থতা' বা despotic intervention মার্কসিজমের গলদ।

কোন দেশে 'প্রকৃত গণতন্ত্র' স্থাপনের চিন্তা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪১-৪২ সালে 'ক্রিটিক অফ দি হেগেলিয়ান ফিলজফ অফ স্টেট'-এ। প্রথমে এটি ছিল নিছক দার্শনিক চিন্তা পরে যা ব্যবহার করা হয় অর্থ নৈতিক বিপ্লব সংগঠনের কাজে। রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য শাসন ব্যবস্থাকে মার্কস এবং এঙ্গেলস অবশ্য সেরকম গুরুত্ব সহকারে বড় করে দেখেননি। এখনো সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ সামাজিক, অর্থ নৈতিক বিষয়গুলির উপর। রাজনৈতিক বিষয়ের গুরুত্ব তার পরে। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এক ভয়ঙ্কর বিপদের বীজ লুকিয়ে থাকে। গণতন্ত্র যাতে একনায়কতন্ত্রে পরিণত না হয় সেজন্য লেনিন ও স্ট্যালিন এবং ক্যাস্ট্রো ও মাও তাঁদের রাজত্বকালে মার্কসিজমের বাস্তব প্রয়োগে কিছুটা পরিবর্ধন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন।

প্রকৃত গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্পর্কিত এই আশঙ্কা নিয়ে মার্কস কিন্তু কোথাও কিছু বলেননি। তিনি বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু বিপ্লবোত্তর দেশের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ছবি আঁকেননি। মার্কসীয় রাজনীতির সমর্থকদের কাছে এ এক বিরাট বাধা। অন্যদিকে মার্কসের প্রদর্শিত পথে বিপ্লবের পর দেশের রাজনৈতিক চেহারা কিরকম হতে পারে তা এঙ্গেলস ১৮৭৮-এ লেখা এক পুস্তিকায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। ওই লেখার মাধ্যমে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন প্রকৃত সমাজতন্ত্র এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মধ্যে তফাৎ কোথায়।

মার্কসিজমের পরবর্তী উন্নতি সাধন বা পরিবর্ধন সম্ভব হয় পরস্পর বিরোধী তাত্ত্বিকদের ক্রমাগত সংঘাতের মধ্য দিয়ে এবং সোসালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক ধাঁচ তৈরীর মাধ্যমে। এই কাজ চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পর একনায়কতান্ত্রিক কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে বিশাল মতভেদের মধ্য দিয়ে। লণ্ডন এবং ম্যানচেষ্টারে আত্মগোপন থাকা অবস্থাতেও মার্কস এবং এঙ্গেলস এই পরিবর্ধনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেন। পুরোপুরি সফল তাঁরা হতে পারেননি। পরে মার্কস নিজে তাঁর পূর্বের অর্থনৈতিক মতবাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিশ্রম করে আরো কিছু তত্ত্ব যোগ করেন। ১৮৫৯ সালে প্রথমে তিনি লেখেন "ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি" এবং পরে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'।

মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী উৎপাদনের অপ্রতিরোধ্য বৃদ্ধি এবং উৎপাদিকা বস্তুগুলির ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাখার আইনগত সম্মতির মধ্যে সংঘাত ক্রমশ সাময়িক থেকে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এর ফলে মুষ্টিমেয় ধনী ও অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক সামর্থের ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে এবং অর্থ সঞ্চিত হয় মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে। এই সংঘাত একদিন পুঁজিপতি সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং শেষ হয় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দরিদ্রদের প্রতি চরম বঞ্চনায়। পরিবর্তে আসে নতুন আদর্শ, উৎপাদন এবং উৎপাদিত বস্তুর সমবণ্টন সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে। সব মানুষই হবে মুক্ত এবং প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করবে দাসত্ব মোচনের সঠিক পদ্ধতির ওপর, সমাজতন্ত্রলাভের পথে যা হবে আসল জোর।

মার্কসের এই মতবাদেও আবার অনেকে "কিন্তু" খুঁজে পান। এর জন্যেই অনেক সমাজতান্ত্রিক দলের নীতি ও বাস্তব কাজে দেখা যায় সংঘাত। বিপ্লবের আগের প্রতিশ্রুতি এবং বিপ্লবোত্তর কর্মধারায় থাকে বিস্তর ফারাক। অবশ্য এই জটিলতা মার্কসিজমের প্রসারে কোনদিনই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। মার্কসের তত্ত্বে এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ার প্রতিশ্রুতি আছে, নিপীড়িত জনগণের সমস্যা সমাধানের এমন কিছু উপায় দেখানো আছে, এবং বলতে দ্বিধা নেই, এরকম কিছু সহজে মন কাড়া বিষয় আছে যা সাধারণ মানুষকে মার্কসিজমের দিকে আকৃষ্ট করে। মার্কসিজমের সমালোচকদের মতে, মার্কসের অনেক তত্ত্বই পরস্পরবিরোধী। অনেক প্রদর্শিত পথই প্রমাণ সাপেক্ষ। আজকের জটিল সমাজব্যবস্থা এবং পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের

সামাজিক জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসিজম অনুসরণ করে নতুন সমাজব্যবস্থা তৈরী করা খুব সহজ কাজ নয়। মার্কসিজম যেমন নিপীড়িত জনগণের উদ্ধারের শক্তিশালী হাতিয়ার সেরকম এর অনেক দুর্বলতাও আছে।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শুরুতে শ্রমিক শ্রেণীর যে দুর্গতি ছিল, ক্যাপিটালিস্ট দেশগুলিতে তা চিরকালই থেকে যাবে এ ধারণাও আজ অনেক ক্ষেত্রে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। সামাজিক পুনর্গঠন, নতুন আইন প্রণয়ন এবং মিশ্র অর্থনীতি চালু করে অনেক দেশেই সাধারণ মানুষের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে অথচ ব্যক্তিগত সম্পদকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয়নি। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যথেষ্ট দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এ ধরণের সমাজ ব্যবস্থারও অনেক প্রসার হতে দেখা গেছে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত আমেরিকায়, যেখানে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত তেমন হয়নি। অন্যদিকে এই শতকে সামাজিক পুনর্গঠনের দ্বারা শ্রেণীবৈষম্য বিলোপের চেষ্টা চলছে সেখানে। কেউ কেউ বলেন, মার্কসিজম শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলির চেয়ে শিল্পে অনুন্নত কৃষি নির্ভর উন্নয়নকামী দেশগুলিতে বৈপ্লবিক রাজনীতির জন্য বেশি প্রযোজ্য। রাশিয়া, চীন, কিউবা অথবা ভিয়েতনাম—যেখানেই কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত হয়েছে, মার্কসের মতবাদ অনুযায়ী বিপ্লব সফল হবার জন্য প্রয়োজনীয় সব পরিস্থিতি বিপ্লবের আগে সেখানে ছিল না। আদিম সামন্ততান্ত্রিক কৃষি নির্ভর সমাজব্যবস্থাকে হটিয়ে দিয়ে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ওই দেশগুলিকে নিয়ে এসেছে শিল্পোন্নয়নের পথে।

আজকের দিনে কথায় কথায় বিভিন্ন দল মার্কসিজমের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে গোঁড়া এবং উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছে মার্কসের বুদ্ধিদীপ্ত তত্ত্ব যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সবদিক থেকে মার্কসিজমকে নতুনভাবে বিচার করার সময় বোধহয় আবার এসে গেছে। কারণ বিভিন্ন দেশের মানুষ এখন জেনে গেছেন যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে জাতীয়তাবোধের মিশ্রণ দেশ ও সমাজের কল্যাণকামী পুনর্গঠনের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

BIVAV

Special Combined Issue
Price Rs. 5.00 October—December '82 Regd. No.
Vol. 6 No. 2 January—March '83 R.N. 30017/76

PRODUCE ·· PRESERVE ** PROSPER

Through a net work of warehouses all over West Bengal. The State Warehousing Corporation offers services for storage and preservation of cereals, pulses, jaggery, cotton, jute, potatoes and other notified commodities like textile's paper, cement, steel, coal, machinery and other merchandise of any size or weight against losses from pests, rodents, birds and vagaries of weather.

Warehouse Receipt issued by the State Warehousing Corporation is a negotiable instrument for raising loan from nationalised and State Banks.

The Corporation also runs a Cold Storage at Tarakeswar, Dist-Hooghly.

For Scientific Storage

Please Contact your nearest State Warehousing Centre.

Or the

WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION

(A Government Undertaking)

6A, RAJA SUBODH MULLICK SQUARE (4TH FLOOR)

CALCUTTA-700013

Phone No. :

26-6038

26-6060

26-6061

26-6062